অনিকেত

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

প্রভা প্রকাশনী
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
১ কে, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-১২

❑ প্রকাশক ❑
শ্রীঅসীমকুমার মণ্ডল
প্রভা প্রকাশনী
১ কে, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-১২

❑ প্রকাশকাল ❑
৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৫

❑ প্রচ্ছদ ❑
শেখর মণ্ডল, কলকাতা-৬

❑ অক্ষরবিন্যাস ❑
তনুশ্রী প্রিন্টার্স
২১বি রাধানাথ বোস লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬

❑ মুদ্রণ ❑
পূর্ণিমা প্রিন্টার্স
টি/২এ/১, গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন
কলকাতা-৬৭

অনিকেত

এমনি করে বেরিয়ে না পড়লে আজও বোধহয় আসা হয়ে উঠত না। শেষ পর্যন্ত বাড়িওয়ালার চোখা চোখা বাক্যবাণই বুঝি অনুঘটকের কাজ করল। যে সয় সে রয় প্রবাদবাক্যটা মিথ্যে প্রমাণ করে দিয়েছে বাড়িওয়ালা।

এবারের সংঘর্ষটা শুরু হয়েছিল কাল রাত্রে। মন্দার অফিস থেকে ফেরার পর। বাড়িতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে ঝাপটে এসেছিল সুরভি। প্রায় আর্তনাদের সুরে বলেছিল,—আর নয়, আর নয়, এ বাড়িতে আর নয়।

মন্দার প্রথমটায় তত আমল দেয়নি। ইদানীং বাড়িওয়ালার সঙ্গে খুচখাচ খিটিমিটি তো লেগেই আছে। কখনও জল নিয়ে তো কখনও কাপড় মেলা, কখনও গলি পরিষ্কার করা, নর্দমার নোংরা...

অথচ এসব কোনও ঝামেলা হওয়ারই কথা ছিল না। বাড়ি ভাড়া দেওয়ার সময়ে অবিনাশ হালদার বলেছিল, জল পাবেন চব্বিশ ঘণ্টাই। এখন কার্যক্ষেত্রে প্রায় প্রতিটি দুপুর সন্ধেতেই কল ঘোরালে বাতাসের শব্দ শুনতে হয় মন্দারদের। পাম্প চালানোর কথা বললেই অমনি অবিনাশবাবুর মুখ হাঁড়ি। এর মধ্যে আপনাদের জল শেষ হয়ে গেল? আশ্চর্য!

অবিনাশগিন্নির মন্তব্যগুলো আরও মারাত্মক,—কী দিনকাল পড়ল! মাসে মাসে এতগুলো টাকা করে পাম্পের বিল গুনছি, তবু ভাড়াটের মন পাওয়া যায় না! কোন বাড়িতে বাড়িওয়ালা এমন দিনে চোদ্দবার করে পাম্প চালায়, অ্যাঁ? সব্বাইকেই মেপেজুপে চলতে হয়। বাড়িওয়ালার জল বলে দেদার মনে খরচ করব...। দেয় তো মোটে সতেরোশো টাকা, এতেই যেন মাথা কিনে নিয়েছে!

ছাদে কাপড় মেলা তো কবেই বন্ধ হয়ে গেছে। সুবালার মা বারবার সিঁড়ি দিয়ে ধুপধাপ ওঠে নামে, এতে নাকি দোতালার প্রাইভেসি নষ্ট হয়! প্রত্যেক রবিবার ভাল করে গলি ঝাঁট দেয় সুবালার মা, তবুও ওপর থেকে টিপ্পনী উড়ে আসে অহরহ। জমাদার ঠিকঠাক নর্দমা সাফ না করলেও দোষটা মন্দারদের! যেন মন্দাররাই ইচ্ছে করে বাড়িটাকে মশা প্রজননের আখড়া বানাচ্ছে! দেওয়ালে এখন একটা পেরেক ঠোকারও উপায় নেই। সামান্য আওয়াজ গেলেই হাঁ হাঁ করে ছুটে আসবে কর্তাগিন্নি।

ভাবতে অবাক লাগে এই স্বামী-স্ত্রীরই কী অদ্ভুত অন্যরকম মূর্তি ছিল। পাঁচ বছর আগে মন্দাররা যখন প্রথম এ বাড়িতে ভাড়া এল তখন কী মোলায়েম ব্যবহার!

অবিনাশ হালদার বলেছিল,—নামেই একতলাটা ভাড়া নিলেন, এখন থেকে কিন্তু আপনারা এই বাড়িরই লোক। আমার গিন্নির মশাই একদমই আপন আপন পর পর ভাব নেই, দেখবেন আপনাদের সঙ্গে কেমন আত্মীয়ের মতো ব্যবহার করবে।

হালদারগিন্নি তো আরও মধুর,—আত্মীয়ের মতো বলছ কেন, ওঁরা তো এখন থেকে আত্মীয়ই। আমরা একসঙ্গে থাকব, সুখে-দুঃখে পরস্পরকে দেখব...। আপনারা দুজনে নিশ্চিন্তে অফিস বেরিয়ে যেতে পারেন, আমি ঘরদোর পাহারা দেব।

ঝিমলির প্রসঙ্গও উঠেছিল কথায় কথায়,—আহা, কী মিষ্টি মেয়ে আপনাদের। ও স্কুল থেকে ফিরে একা একা থাকবে কেন, সোজা যেন দোতলায় চলে আসে। টিভি দেখবে, কলকল করবে...আমার আগের ভাড়াটের ছেলেটা তো আমাদের ঘরেই মানুষ হয়ে গেল, তাই না গো?

—বটেই তো। আমার মেয়ে তো বাপ্পা অন্ত প্রাণ ছিল। নিজের ভাই নেই তো কী আছে, ভায়েরও বাড়া। খুকুর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর ওই ছেলেও যে কতদিন দিদি দিদি করে খুকুর শ্বশুরবাড়ি ছুটেছে।

সুরভি ঘরপোড়া গরু। বিয়ে হয়ে ইস্তক নয় নয় করে তিন তিন বার বাড়ি বদল করেছে দশ বছরে। ঠিক আগের বাড়িওয়ালার সঙ্গে প্রথম প্রথম সম্পর্ক বেশ মাখো মাখো ছিল। এক-দেড় বছর যেতে না যেতেই মুখ দেখাদেখি বন্ধ। তাদের আবার জল দেওয়ার পদ্ধতি ছিল ভিন্ন রকম। টাইমে টাইমে আসবে, ছ্যারছ্যার করে বিশ-পঁচিশ মিনিট পড়বে, ব্যাস্, খতম। পোষালে থাকো, নইলে কাটো। তার আগের বাড়িটায় তো আলো-বাতাসই ঢুকত না। লোডশেডিং হলে দিনের বেলাতেও মোমবাতি জ্বেলে ভূতের মতো নড়াচড়া করতে হতো। সে বাড়িতে বছর খানেকের বেশি টেকা যায়নি। একদম পয়লা বাড়িটা অবশ্য মন্দ ছিল না, বাড়িওয়ালার সঙ্গেও শেষ অবধি সুসম্পর্কই ছিল। তবে সেখানে ঘর ছিল মোটে একখানা। আত্মীয়-বন্ধু এলে বসতে দেওয়ার জায়গা নেই, রান্না করে এনে শোওয়ার ঘরেই বসে খাও...

তুলনায় অবিনাশ হালদারের বাড়ি তো স্বর্গ। ঘর একখানাই বটে, কিন্তু ঘরের সাইজটি বিশাল। সঙ্গে ছোট হলেও একটা ড্রয়িং ডাইনিং স্পেস। বাথরুম রান্নাঘরও বেশ পছন্দসই। সবচেয়ে বড় সুবিধে অবিরাম জল এবং হাতের কাছে বাজার, বাসস্ট্যান্ড। এমন একটা জায়গায় এসে পড়ে বাড়িওয়ালার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে ফের গৃহচ্যুত হওয়ার আশঙ্কায় যেতে সুরভি মোটেই রাজী নয়।

তাই কথাগুলো কানে ঢুকলেও মগজে প্রবেশ করতে দেয়নি সুরভি। তাছাড়া সে খামোখা ঝিমলিকে রোজ রোজ দোতলায় পাঠাতে যাবেই বা কেন? ঝিমলি যথেষ্ট বুঝদার মেয়ে, কোনও বিটকেল বায়নাক্কা নেই, কাজের লোকের কাছে থাকাতেও সে ছোট থেকে যথেষ্ট অভ্যস্ত। স্কুল থেকে ফিরে নিজের মনে আঁকাআঁকি করে, নয়তো খেলনা পাজল্ নিয়ে বসে যায়।

এ বাড়ি এসে সুরভি আরও অনেক কিছু বর্জন করেছিল। বাড়িওয়ালার সঙ্গে নো বাটি চালাচালি, নো চিনি-দুধ চাওয়া-চাওয়ি, গায়ে পড়া ভাব তো নয়ই, হাতে একটা সিনেমার টিকিট বেশি থাকলেও কখনও হালদারগিন্নিকে সঙ্গে যেতে সাধেনি সুরভি। ঘাটশিলা না গালুডি কোথায় যেন এক আত্মীয়ের বাড়ি গেল অবিনাশ হালদারেরা, সুরভিরা আসার পর পরই বড়দিনে একসঙ্গে সেখানে যাওয়ার জন্য হালদারগিন্নির কী ঝুলোঝুলি, মন্দার আর সুরভি ছুতো দেখিয়ে এড়িয়ে গিয়েছিল। বাড়িওয়ালা আর ভাড়াটের মধ্যিখানে সব সময়ে একটা দূরত্ব থাকা ভাল, তাতে সম্পর্কটা তেতো হয় না।

তবু তিক্ততাটা এসেই গেল। এ বাড়িতে ঢোকার সময়ে বিশ হাজার টাকা অ্যাডভান্স দিয়েছিল মন্দার, মাসে মাসে পাঁচশো টাকা করে কাটা যেত ভাড়া থেকে। অগ্রিম শোধ হওয়ার পর থেকেই শুরু হয়ে গেল নানান বখেড়া। মন্দার দুশো টাকা ভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছে, তবুও। এখন অবিনাশ দম্পতির সঙ্গে বাদানুবাদ মন্দার সুরভির নিত্যকার ব্যাপার।

কাল তাই মন্দার প্রথমে সুরভির ক্ষোভে জল ঢালতে চেয়েছিল। ঠাট্টার সুরে বলেছিল,—আজ আবার কী নিয়ে লাগল, অ্যাঁ? গরম বাতাস নীচ থেকে ওপরে উঠছে বলে? নাকি আমাদের ইলিশমাছের গন্ধে ওদের গা গুলিয়েছে?

সঙ্গে সঙ্গে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল সুরভি,—ফাজলামি কোরো না।...এরা অতি অসভ্য, অতি বজ্জাত। জানো আমাকে কী বলেছে আজ?

—কী?

—কোথ্থেকে কোন কাক বোধহয় এঁটো-কাঁটা মুখে করে এনে গলিতে ফেলেছিল, সেই ছুতো ধরে...। বলে আমরা নাকি ছোটলোকের বেহদ্দ! খেয়েদেয়ে এঁটোকাঁটা যে ঠিক জায়গায় ফেলতে হয় তাও নাকি শিখিনি!

—ছোটলোক বলেছে?

—বলল তো! আমি অফিস থেকে ফিরে সবে শাড়ি ছাড়ছি, অমনি দরজায় দুমদুম ধাক্কা। ইতরের মতো। কী উগ্রচণ্ডী মূর্তি, ঝিমলি পর্যন্ত ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছিল!

ঝিমলিও পোঁ ধরল,—হ্যাঁ বাবা, কী বিশ্রী ভাষায় কথা বলছিল জেঠিমা।

সুরভি খেঁকিয়ে উঠল,—আর জেঠিমা বলতে হবে না। বল্ বাড়িউলি।

মন্দারের আর জামা খোলা হলো না। গুমগুমে স্বরে বলল,—তোমরা চুপচাপ শুনে গেলে? কিছু বলতে পারলে না?

—আমরা কি ওদের মতো? ওদের লেভেলে নামতে পারব আমরা?

—তা সেই নোংরাটা কি এখনও গলিতেই পড়ে আছে?

—নাহ্। আমি ফেলে দিয়ে চান করে নিয়েছি।

—কেন ফেললে? দোতলায় ছুঁড়ে দেওয়া উচিত ছিল।

—বললাম তো। ওদের স্তরে নামতে পারব না।...ওই চামারদের বাড়ি এবার ছাড়ো। কতদিন ধরে বলছি এবার একটা কিছু করো নিজের...

সুরভির পুরো গজগজটা শোনার ধৈর্য ছিল না মন্দারের। দুপদাপ উঠে গেল দোতলায়। আঙুল তুলে তুলে কথা শোনাল দশখানা। বিনিময়ে কুড়িটা ফেরত দিল বাড়িওয়ালা-বাড়িওয়ালি।

রাগে গরগর করতে করতে নেমে এল মন্দার।

সুরভি বলল,—পারলে? পারলে ওদের সঙ্গে? ভাড়াবাড়ির মায়া এবার কাটাও, পরের বাড়িতে ঢের হয়েছে।

মন্দার দাঁতে দাঁত ঘষল,—হুম্, কিছু একটা এবার করতে হয়।

—অমন এড়িয়ে যাওয়া কথা বোলো না। সিরিয়াসলি খোঁজখবর নাও।

তখনকার মতো থেমে গেল কথাবার্তা, স্নান-টান সারল মন্দার। কদিন ধরে থসথসে গরম পড়েছে, ঘামাচি বেরিয়েছে বুকে-পিঠে, পাউডার মাখল ভাল করে। ঝিমলির স্কুলে সামার ভেকেশান চলছে, রাশি রাশি হোমটাস্ক, রেকারিং ডেসিমেলের অঙ্ক নিয়ে ঝিমলির নাস্তানাবুদ দশা। মন্দার মেয়ের একটা-দুটো অঙ্ক কষে দিল। খেটেখুটে।

রুটি বানিয়ে খেতে ডাকল সুরভি। ডাইনিং টেবিলে ফের পাড়ল কথাটা। মন্দারের প্লেটে তরকারি দিয়ে বলল,—কিছু ভাবলে?

মেয়ের অঙ্ক নিয়ে ভাবিত ছিল মন্দার। অন্যমনস্ক ভাবে বলল,—কী ভাবব?

—যা বললাম তখন। ওই বাড়ি করার ব্যাপারে।

—বাড়ি করা কি সহজ কাজ? জমি কেনো, দাঁড়িয়ে থেকে মিস্ত্রি খাটাও...

—ধুস্, আমি ফ্ল্যাটের কথা বলছি।

সঙ্গে সঙ্গে বারো বছরের ঝিমলির কুটুস মন্তব্য,—হ্যাঁ বাবা, ফ্ল্যাটই তো ভাল।

—ঠিক আছে, ফ্ল্যাটই নয় হবে।

—তোমার তো বলা! হবে বলেই ঘুমিয়ে পড়বে। ক্যাসারোল থেকে গরম

রুটি নিয়ে সুরভি নিজেও বসে গেছে খেতে। সকালের ইলিশভাপার জন্য একগাল ভাতও নিল। ইলিশই হোক কি অমৃত, মন্দার মরে গেলেও রাতে ভাত ছোঁবে না। বেছে বেছে তাকে ঘাড়ের পিসটা দিল সুরভি, ঝিমলিকে পেটি। নিজে সন্তর্পণে গাদার কাঁটা বাছছে। হঠাৎই কী মনে পড়ে যেতে বলল,—এই, গাঙ্গুলিপাড়ার মুখটায় দেখেছ এক ভদ্রলোক অফিস করেছে? বাইরে ইয়া সাইনবোর্ড—নির্মিয়মাণ ফ্ল্যাটের অগ্রিম বুকিং করুন?

—ও তো সুব্রত নন্দীর অফিস।

—তুমি চেনো?

—মুখচেনা।

—তা ওঁকে অ্যাপ্রোচ করা যায় না?

—করা যায়। মন্দার স্যালাডের প্লেট থেকে এক কুচি শশা ফেলল মুখে,—ওর কথা আমি আগেও ভেবেছি। তবে...

—কী তবে?

—লোকটা একসময়ে পার্টি-টার্টি করত। বেশ মাস্‌লম্যান গোছের ছিল। মানে ওই পার্টির অ্যাকশান স্কোয়াড থাকে না...

—তাতে আমাদের কী? এখন তো লোকটা প্রোমোটার।

—হুম্।

—আমরা পয়সা দিয়ে ফ্ল্যাট বুক করব, টাইম টু টাইম টাকা দিয়ে যাব, লোকটা আগে গাঁটকাটা ছিল, না সন্ন্যাসী ছিল, তা দিয়ে আমাদের কী আসে যায়?

মন্দার হাসল মনে মনে। এত অবলীলায় সুরভি কথাগুলো বলছে, যেন ফ্ল্যাট কেনার টাকা আলমারিতে মজুত আছে, গিয়ে শুধু ঢেলে দাও, হাহ্! সুরভিটা বড্ড বেশি ইমোশানে চলে। ব্যাপারটা ধর তক্তা মার পেরেক হলে মন্দার কি এতকাল হাত গুটিয়ে বসে থাকত?

তবে ওই মুহূর্তে ওসব বলে সুরভিকে আর চটাল না মন্দার। বলল,—হুম্ দেখি কী করা যায়।

দেখি দেখি করেই হয়তো মন্দার আরও কিছুদিন কাটিয়ে দিতে পারত, কিন্তু তার আর সুযোগ রইল না। আজ সকালে কল খুলতেই ভুস ভুস। হাওয়া বেরোচ্ছে।

তুম্বো মুখে দোতলায় ছুটে যেতেই অবিনাশ হালদারের সাফ উত্তর,—ট্যাংকে জল আছে, আপনার লাইনে হয়তো আসছে না। পাইপ পরিষ্কার করান গিয়ে।

—কিন্তু কাল রাতেও তো পড়ছিল।

—তার আমি কী জানি? প্লাম্বার ডাকুন, প্লাম্বার বলবে।

—বাহ্, পাইপ পরিষ্কার করানোটা তো আপনার কাজ।

অবিনাশগিন্নি পাশ থেকে বলে উঠল,—হ্যাঁ, এর পর বলবেন আপনাদের পায়খানা পরিষ্কার করে দেওয়াটাও আমাদের কাজ।

মন্দার ঝেঁঝে উঠল,—বটেই তো। কোনও কিছুই তো আপনাদের কাজ নয়। পাঁচ বছর আছি, একবার কলি দেওয়াটাও তো কাজ বলে মনে হয়নি। এদিকে লাস্ট ইয়ারে তো দিব্যি নিজেদের ঘরের রঙ ফিরিয়ে নিলেন।

—আমাদের বাড়ি, আমরা কোথায় কী করব আপনি বলে দেবেন?

আবার একটা তুমুল বাধতে যাচ্ছিল, মন্দারই সংযত করে নিল নিজেকে। গটমট করে নীচে নেমে এল।

সুরভি বেড়ালের মতো কান খাড়া করে ছিল। মুখ বেঁকিয়ে বলল,—কী, শুনলে তো? যাও, এবার ঘাড় হেঁট করে কলের মিস্ত্রি খুঁজে আনো।

প্লাম্বার প্রায় ঈশ্বরের মতোই দুর্লভ। আর ছুটির দিনে তো কথাই নেই, তাদের সন্ধান পেতে ঘাম ছুটে যায়। প্রচুর ঘুরে টুরে একটা বুড়ো লোককে ধরে আনল মন্দার। সাকশান টাকশান করতে জল এল বটে, তবে কেমন মরা মরা! এ অঞ্চলে জলে আয়রন খুব, পাইপের গায়ে মোটা আস্তরণ পড়েছে, পুরো লাইনটাই নাকি বদলানো দরকার।

গুনে গুনে একশোটি টাকা নিল প্লাম্বার। তাকে বিদেয় করেই মন্দার বলল,—চটপট শাড়ি বদলে নাও।

সুরভি অবাক হয়ে বলল—কেন?

—আজ রোববার, আজই ঘুরে আসি চলো।

—কোথ্থেকে?

—সুব্রত নন্দীর কাছ থেকে।

—এক্ষুণি যাব কী করে? রান্নাবান্না সব পড়ে আছে।

—থাকুক। এসে সেদ্ধভাত করে নিও।...আর সহ্য হচ্ছে না, আর সহ্য হচ্ছে না।

(দুই)

প্রকাণ্ড একখানা কাগজ টেবিলে মেলে ধরে সুব্রত নন্দী বলল,—দিস ইজ আওয়ার প্ল্যান। প্রত্যেক ফ্লোরে তিনটে করে ফ্ল্যাটের প্রভিশান। দু'পাশে দুটো টু রুম ডাইনিং, মাঝেরটা ছোট, ওয়ান রুম।

সুরভি ঝুঁকে পড়ল কাগজটার ওপর। সাদা কাগজের গায়ে অসংখ্য জ্যামিতিক

আঁকিবুঁকি। বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র, রম্বাস, ট্র্যাপিজিয়াম, সরলরেখা, বক্ররেখা। কী অদ্ভুত গাণিতিক নিপুণতায় এঁকে দেওয়া হয়েছে তিন তিনটে গৃহ! উঁহু, গৃহ নয়, গৃহের নাগরিক সংস্করণ।

মন্দারও নক্‌শাটা জরিপ করছিল। কৌতূহলী স্বরে জিজ্ঞেস করল,—সিঁড়ি কোথায়?

—হা হা, সিঁড়ি ছাড়া কি বাড়ি হয়? এই তো। ক্রস ক্রস করা অংশটাতে আঙুল বুলিয়ে ফের ফ্ল্যাটের চৌখুপিতে ফিরল সুব্রত নন্দী,—আপনাদের জন্য আইডিয়াল হবে এই ফ্ল্যাটটা। তিনতলার ওপর, খোলামেলা, পার্কও পাবেন এদিকটায়। মানে সাউথ পুরো ওপেন। পার্কের অ্যাডভান্টেজটা বুঝছেন? দক্ষিণ কোনও দিনই বন্ধ হবে না।

মন্দার খুশি খুশি মুখে বলল,—কিন্তু ফ্ল্যাটের এনট্র্যান্সটা ঠিক কোনটা বুঝছি না তো!

—এই যে, এখানটা কাটা রয়েছে। তারপর এই ঢুকেই লিভিং কাম ডাইনিং স্পেস। সাইজটা আপনি খারাপ বলতে পারবেন না। নাইন বাই টোয়েন্টি মতন। আর এই হলো আপনার মাস্টার বেডরুম। ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ বাই নাইন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ...

সুরভি জিজ্ঞেস করল,—অন্য বেডরুমটার যেন কত সাইজ?

—মাস্টার বেডরুমের চেয়ে মারজিনালি ছোট। দশ বাই দশ। বাথরুম ধরুন গিয়ে সাড়ে চার বাই আট।... আর এইটাই হলো আসল ঘর। সুব্রত চোয়াল ছড়িয়ে হাসল,—বউদির কিচেন।

—এ তো বেশ বড়। সুরভির চোখ জ্বলজ্বল।

—আমি নিজে আর্কিটেক্টের সঙ্গে বসে এটা বাড়িয়েছি। ছোট কিচেনে রান্না করতে বউদিদের বড় কষ্ট হয়।

চমৎকার গুছিয়ে কথা বলতে পারে সুব্রত। গাঁট্টাগোট্টা চেহারা, গায়ের রঙ বেশ ফর্সা, থ্যাবড়া নাক, ফোলা ফোলা গাল, চোখ দুটো সামান্য লালচে। মন্দারের মনে হলো, অ্যালকোহলের প্রভাব। তবে লোকটার মুখটা বেশ টানছিল মন্দারকে। এক ধরনের গরিমা যেন রঙিন বিজ্ঞাপনের মতো ঝলমল করছে সুব্রতর মুখে।

তবে সুব্রত নন্দীর ওই গরিমা যেন বাড়িয়ে দিয়েছে দুটো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাইজের অ্যালসেশিয়ান। জুলজুল চোখে প্রভুর দু'পাশে বসে আছে কুকুর দুটো, ভারী নিরুত্তাপ ভঙ্গিতে।

জন্তু দুটোকে দেখে প্রথমটা তো রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়েছিল সুরভি। বাপ্‌স রে, কী শান্ত অথচ কী হিংস্র চেহারা! লকলক করছে লম্বাটে জিভ, আর ফোঁটা

ফোঁটা জল ঝরাচ্ছে।

সুরভির ভয় দেখে সুব্রতর পুরু ঠোঁটে অভয় হাসি,—ওরা কিন্তু কিছু করবে না বউদি। আসলে দেখতেই যা সাংঘাতিক, আদতে তত ভায়োলেন্ট নয়।

অন্যমনস্ক হাতে পিঠে আঁচলটা টেনে নিল সুরভি। কথা বলতে বলতে মন্দারের থেকে সুরভির দিকেই সুব্রতর দৃষ্টি বেশি। চোখটা তেমন লোভাতুর নয়, তবু যেন কী আছে! অস্বস্তি হয়।

মন্দার সিগারেট ধরিয়েছে। প্যাকেট বাড়িয়ে দিল সুব্রতকে। আলতো ভাবে জিজ্ঞেস করল,—আপনার এখন কটা প্রোজেক্ট চলছে?

—অফিসিয়ালি তিনটে রানিং। একটার কাজ অবশ্য মোটামুটি শেষ। আর একটা চলছে কসবায়। আর এইটা শুরু হবে।

সুরভি প্রশ্ন করল,—আপনি একাই সব দেখাশুনো করেন?

—একা কী হয়। লোকজন আছে। আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ার কন্ট্রাকটার, তিনে মিলে বিল্ডিং প্রোমোটার। ছন্দ মিলিয়ে বলতে পেরে সুব্রত নিজেই গদগদ,—আমার সব কাজ করে এক্সপিরিয়েন্সড হ্যান্ডরা। আমি তো আর বড়লোকদের জন্য অট্টালিকা বানাই না, আমি সেবা করি মধ্যবিত্তদের। আমি ফিল্ করতে পারি মধ্যবিত্তদের কাছে একটা ফ্ল্যাট মানে কতখানি। সারাজীবনের সঞ্চয় ঢেলে তারা একবারই আস্তানা খোঁজে। ফর পারমানেন্ট পারপাস্। এটা বুঝি বলেই আমি প্রাণপণ চেষ্টা করি যাতে এই মানুষগুলোর মুখে একটু হাসি ফোটাতে পারি। কড়া নজর রাখি যাতে তাদের কষ্টের টাকাটা জলে না যায়।

একটু যেন বেশিই বকছে সুব্রত। কথার জালে মোহিত করে ঠকিয়ে দেবে না তো? মন্দার প্রশ্ন করল,—ফ্ল্যাটের মোট এরিয়া তাহলে কত হচ্ছে?

—সুপারবিল্ট্ নিয়ে ধরুন গিয়ে সাতশো কুড়ি মতো।

সুরভি বলল,—সুপারবিল্ট্?

—হ্যাঁ। সুব্রত কাঁধ ঝাঁকাল,—ধরুন মোট ফ্ল্যাট হচ্ছে গিয়ে বারোটা। তার মধ্যে তো অনেক কিছুই কমন থাকছে। সিঁড়ি, সেপ্‌টিক ট্যাংক, ছাদ, কমন প্যাসেজ...। এ সবের জন্য ছাড়া ল্যান্ড এরিয়াটা সকলের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করতে হবে তো।

—এগ্‌জ্যাক্ট কার্পেট এরিয়া কত হবে?

—ওই ফিফ্‌টিন পারসেন্ট মতো বাদ দিন। অ্যারাউন্ড সওয়া ছশো। আমার তো মনে হয় আপনাদের মতো ছোট ফ্যামিলির পক্ষে একদম পারফেক্ট।

মন্দার কথাটা মেনে নিল। তাদের অফিসের দেবদত্ত সদ্য সদ্য ফ্ল্যাটে গেছে, তারও তো ওই রকমই মাপ। সাতশো চল্লিশ মতো, সুপারবিল্ট্ নিয়ে। তার

চেয়ে দশ-বিশ স্কোয়্যার ফিট কমে তার ফ্ল্যাট কীই বা এমন ছোট হবে। দেবদত্তর ফ্ল্যাটটা তো খুব ক্ষুদে মনে হয় না।

নক্‌শাটা গুটিয়ে রাখছে সুব্রত। বলল,—তাহলে আপনাদের জন্য ওই ফ্ল্যাটটাই মার্ক করে রাখি? তিনতলারটা?

মন্দার তবু ঈষৎ দ্বিধাগ্রস্ত যেন। বলল,—কবে নাগাদ শুরু করছেন কাজ?

—অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল্‌। মানে প্ল্যান স্যাংশান হয়ে গেলে আর একদিনও দেরি করা নয়।

—তাও কতদিন লাগতে পারে মনে হয়? বুঝতেই তো পারছেন আমাদেরও সেই মতো টাকাপয়সার অ্যারেঞ্জমেন্ট...। মন্দার দেঁতো হাসল,—লোন-টোনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে তো।

—দূর, ওটা আজকাল একটা ভাবনা নাকি? টাইমলি সব কাগজপত্র দিয়ে দেব, সাত দিনে পেয়ে যাবেন। সুব্রতর চোখ সার্চলাইটের মতো ঘুরল মন্দার-সুরভিতে,—বলেন তো আমিও লোনের বন্দোবস্ত করে দিতে পারি।

—না না, কাগজপত্র ঠিক থাকলে অফিস থেকেই লোন পেয়ে যাব। সুরভি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, তা আপনি রেটটা ফাইনালি কী করছেন?

—লজ্জা দিচ্ছেন কেন বউদি? সুব্রতর মুখে এবার বিনীত হাসি,—আপনারা পাড়ার লোক, আপনাদের সঙ্গে রেট নিয়ে কী কচকচ করব! এখানে মার্কেট রেট যাচ্ছে এখন নশো, ওটা তো আমি আপনাদের কাছে চাইতে পারব না। বলেই গলা নামিয়েছে,—আপনাদের জন্য সাড়ে আটশো। শুধু আপনাদের জন্যে।

মন্দার আর সুরভি চোখ চাওয়া-চাওয়ি করল। রেটটা যেন সত্যিই একটু কম মনে হচ্ছে।

সুব্রত ফের বলল,—আমার ওপর আস্থা রাখুন বউদি। আমি যতটা পারি ততটাই কমে করার চেষ্টা করব। আফটারঅল দিস ইজ আ সোশাল সারভিস্‌। আপনাদের সামান্যতম উপকারেও যদি আসতে পারি...

—কবে নাগাদ বুক করতে হবে?

—যেদিন আপনাদের খুশি। তবে বোঝেনই তো ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ। ওই তিনতলার ফ্ল্যাটটা কিন্তু সত্যিই অ্যাট্রাকটিভ. যদি পছন্দ করে বুক করে রাখেন তো আপনারাও নিশ্চিন্ত। আর ক্যাশও যতটা দিয়ে দিতে পারবেন, ততটাই আপনাবা এগিয়ে রইলেন।

মন্দার আর সুরভি উঠেই পড়ছিল. হঠাৎ অফিসঘরের দরজার মাথায় চোখ আটকে গেল মন্দারের। ঢাউস একখানা রামকৃষ্ণদেবের ছবি, পাশে কার্ল মার্কস্‌ও বিরাজমান। কী অপূর্ব সহাবস্থান।

মন্দারের থমকে যাওয়াটা নজরে পড়েছে সুব্রতর। হেসে বলল, কী দেখছেন?

মন্দার তাড়াতাড়ি বলল, রামকৃষ্ণদেবের ছবিটা খুব জ্যান্ত তো!

—ওটা একটা রেয়ার ছবি। বরানগরের এক ঠাকুরের ভক্তর কাছে পেয়েছিলাম বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়েছে সুব্রত। ছবির তলায় এসে দু'হাত কপালে ঠেকাল,—এই মানুষটাকে আমি খুব মানি মশাই।

—অনেকেই মানে। আমরাও মানি।

—আমি একটু বেশি করে মানি। উনিই তো আমাদের লাইনের আসলি কথাটা বলে গেছেন।

মন্দারের চোখ বিস্ময়ে গোল গোল।

—বুঝলেন না? টাকা মাটি, মাটি টাকা। কতকাল আগে কথাটা উনি বুঝেছিলেন বলুন?

বাইরে এসে মন্দার আর সুরভি জোর একচোট হাসল। কী কথার কী অর্থ করে নিয়েছে সুব্রত নন্দী!

রবিবারের সকাল ছুটির আলস্য মেখে গা এলিয়ে বসে আছে। মোড়ের চা-দোকানে জটলা বেঁধে আড্ডা দিচ্ছে ছেলেরা, পথচারীদের গতি মন্থর। সবে সাড়ে দশটা বাজে, এর মধ্যেই রোদ্দুর যথেষ্ট চড়া। মন্দার আর সুরভি দ্রুত পা চালাচ্ছিল। বাড়িতে সব কাজ পড়ে আছে।

হঠাৎ মন্দার বলল,—এই, স্পটটা একবার দেখে যাবে নাকি?

সুরভি অবাক,—তুমি চেনো নাকি জায়গাটা?

—অফকোর্স চিনি। চন্দনপুকুর পার্কটার পাশেই তো।

—সে তো বেশ খানিকটা হাঁটতে হবে।

—কত আর! মিনিট পাঁচ-সাত। চলোই না।

—সংসারের কাজগুলোর কী হবে?

—বললাম তো, সেদ্ধভাত খাব আজকে। চলো, দেখেই যাই।

সুরভি আর আপত্তি করল না। এমন একটা শুভ দিনে মন্দারের কথায় আপত্তি করা বুঝি শোভাও পায় না।

সুব্রত নন্দীর অফিস থেকে বেরিয়ে খানিক হাঁটলে রিক্সাস্ট্যান্ড, সেখান থেকে একটা সরু রাস্তা ভেতরে ঢুকে গেছে। রাস্তার একেবারে শেষ প্রান্তে ছোট্ট একটা পার্ক। বাচ্চাদের জন্য। এখানেই একসময়ে একখানা ছোট পুকুর ছিল, পুকুর বুজিয়ে অনেকদিন আগেই বেশ কয়েকটা বাড়ি উঠে গেছে।

পার্ক আর বাড়িগুলোর মধ্যিখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল মন্দার। আঙুল তুলে দেখাল—ওই যে ওইটা। ওই বাড়িটা। ওটাই ভেঙে...

অদূরে এক ভাঙাচোরা প্রাচীন একতলা বাড়ি। কলিবিহীন বাড়িটার গায়ে সময়ের ঘন কালো শ্যাওলা।

সুরভির চোখ বড় বড়,—ও বাবা, এ যে একদম ভুতুড়ে বাড়ি গো।

—ভুতুড়েই তো। মালকিন এক থুরথুরে বিধবা। বুড়ি অবশ্য একা থাকে না, সঙ্গে এক ভাইঝি আছে। মাঝবয়সী। আনম্যারেড।

—তুমি এত জানলে কী করে?

—শুনেছি। পাড়াতেই। সুব্রত নন্দীর সঙ্গে বুড়ির একটা এগ্রিমেন্ট হয়েছে। ওরাও নাকি একটা ফ্ল্যাট পাবে। সঙ্গে কিছু ক্যাশও।

—এত খবর জানো, কই আমায় বলোনি তো?

—হুঁ হুঁ বাবা, আমার মাথাতেও একটা ফ্ল্যাটের প্ল্যান চলছিল, সব খোঁজই রাখছিলাম। মন্দার হাসল,—আমায় যতটা ক্যালাস্ ভাবো, আমি ততটা নই।

সুরভি হাসতে গিয়েও হাসল না। কী যেন ভাবছে। জিজ্ঞেস করল,—ভদ্রমহিলা নিজের বাড়ি ভাঙতে দিচ্ছেন?

—আরে, বুড়ির তো লাভই লাভ। ওই হানাবাড়ি ওর কোন কম্মে লাগছে? বরং ঝকঝকে ফ্ল্যাট পেয়ে গেল, সঙ্গে ক্যাশ। বুড়ি মরলে মেয়েটারও একটা গতি হলো।

সুরভি তবু যেন ঠিক মানতে পারছে না। ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলল,—যাই বলো বাপু, নিজের বাড়ির একটা আলাদা দাম আছে। কত স্মৃতি আছে ও বাড়িতে, কত সুখ-দুঃখ.....আমি হলে কখনই ভাঙতে দিতাম না।

—এ তো অদ্ভুত কথা! কেউ না দিলে আমাদের মতো ভূমিহীনবা জায়গা পাবে কোথ্থেকে? তোমার-আমার শখের ফ্ল্যাটই বা তৈরি হবে কোথায়? শূন্যে?

সুরভির তবু মন খুঁতখুঁত,—আচ্ছা, বাড়িটা ভাঙা হলে মহিলাবা যাবেন কোথায়? বাড়ি ভেঙে ফ্ল্যাট উঠতে তো বেশ কিছুদিন সময় লাগবে।

—তুমি ওদেব নিয়ে ব্যস্ত হলে কেন বলো তো? সে ভাবনা তো প্রোমোটারের। মন্দার অসহিষ্ণু হলো,—তুমি আগে ভাবো তুমি কী কববে? আই মিন, আমরা কী কবব? ফ্ল্যাটেব জন্য লড়ে যাব, কি যাব না?

—নাহ্, চেষ্টা তো করতেই হবে। ক'দিন আর অন্যের বাড়িতে দযাপ্রার্থী হয়ে বাস করব! যেখানেই একটু পুরনো হব, বাড়িঅলা বাঁকা চোখে তাকাতে শুরু করবে।....হালদার-বাবুদেরও তো দেখলাম, কেমন চোখেব সামনে বদলে গেল!...আর ভাল্লাগে না।

মন্দার মাথা দোলালো, —গুড। ভেরি গুড।

(তিন)

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে মনে মনে হিসেব কষছিল মন্দার। সাতশো কুড়ি স্কোয়্যার ফিটের ফ্ল্যাট, মানে ধরা যাক সওয়া সাতশো। অর্থাৎ দাম পড়বে সওয়া সাতশো ইনটু আটশো পঞ্চাশ....ছ'লাখ পনেরো প্লাস। মোটামুটি ছ'লাখ কুড়ি। এর সঙ্গে আছে রেজিস্ট্রেশান ফি, আছে টুকটাক আনুষঙ্গিক। ফিটিং-টিটিং তো নিজের পয়সাতেই করতে হবে, প্রোমোটার তো সবটা করেও দেবে না। সেখানেও না হোক বিশ-পঁচিশ হাজার যাবে। রেজিস্ট্রেশান ফি এখন সাত পারসেন্ট, দেবদত্ত বলছিল। তার মানে আরও হাজার পঁয়তাল্লিশ। উঁহু, অত মনে হয় লাগবে না। সুব্রত নন্দী থোড়াই পুরো টাকা সাদায় নেবে! কোনও প্রোমোটারই নেয় না। যদি সিক্সটি পারসেন্ট হোয়াইটে নেয়, দাম এসে দাঁড়াবে চার লাখের নিচে। হেসে খেলে তখন বেঁচে যাবে হাজার পনেরো। অবশ্য ছ'লাখ সাড়ে ছ'লাখ থেকে পনেরো হাজার কমলে কী-ই বা এমন সুসার হবে!

দাম কম দেখানোরও সমস্যা আছে। অন্তত মন্দারদের। তারা দুজনেই দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ, সাদা ছাড়া কালো টাকা তাদের আছে কোথায়! দাম কম হলে উল্টে বাঁশ। লোন কম মিলবে। ব্যাংকগুলো এখন ধার দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছে বটে, কিন্তু তাদের লিমিট তো এইট্টিফাইভ পারসেন্ট। অর্থাৎ মন্দারদের জুটবে মেরে কেটে সাড়ে তিন লাখ। বাকি লাখ আড়াই-তিন কি আকাশ থেকে পড়বে?

সমস্যা আরও আছে। সাড়ে তিন লাখ দেনা করলে মাস মাস শোধ দেওয়ার ব্যাপারও তো আছে। মাসিক কত করে পড়তে পারে? চার-পাঁচ হাজার? কম নয়। প্রায় সাধ্যের বাইরেই। একদিন-দু'দিনের কথা তো নয়, টানা পনেরোটা বছর টানতে হবে। পারবে তো? নতুন করে আর সঞ্চয় হবে না এটা একেবারে নিশ্চিত।

এখনই বা কতটুকু সঞ্চয় হয়? দুজনে মিলিয়ে রোজগার প্রায় সতেরো হাজার, কিন্তু খরচাও তো আছে। ঝিমলির স্কুলের মাইনেই তো ছশো। স্কুলবাস-টুলবাস মিলিয়ে মেয়ের জন্যই তো হাজার ধরে রাখতে হয়। সেভেনে উঠল ঝিমলি, ওর অঙ্কটঙ্কগুলো ক্রমশ জটিল হচ্ছে, একজন অঙ্কের টিউট্যর রাখা খুব জরুরি। ইংরিজিতেও ঝিমলির একটু দুর্বলতা আছে....। এই সেভেন এইটেই মেয়ের ভিত শক্ত না করে দিলে পরে আর ঝিমলি সামাল দিতে পারবে না। দুটো ভাল টিচার মানে অন্তত হাজার, এই খরচটাও ভাবতে হবে। সুরভি তার বাবা মার একমাত্র সন্তান। বাবা মারা যাওয়ার পর সামান্য কটা ফ্যামিলি পেনশানের টাকায় সুরভির মার চলে না, নিয়ম করে প্রতি মাসে তাঁকে কিছু টাকা দিয়ে আসে

সুরভি। মার দেখাশুনোর জন্য সুরভি একটা রাতদিনের লোক রেখে দিয়েছে, তার মাইনেটাও সুরভিই দেয়। এই খরচটা কি কমানো যাবে? নাকি নিজের বাবা-মাকে টাকা পাঠানো বন্ধ করবে মন্দার? ক্ষীরপাইতে দেশ মন্দারদের, সেখানেই দাদার সঙ্গে আছেন বাবা-মা। দূরে থাকে বলে মন্দার কি তার কর্তব্য কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারে? গত বছরের আগের বছর মন্দারের বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন, চিকিৎসা করতে তাঁকে আনা হলো কলকাতায়। তখন ডাক্তার দেখানো, নার্সিংহোমে ভর্তি করা, গলব্লাডার অপারেশান, সব দায়িত্বই এসে পড়েছিল মন্দারের ঘাড়ে। মন্দার দায় বলে মনে করেনি, তবু তো দায়। নয় নয় করে চিকিৎসায় হাজার বিশেক টাকা গলে গিয়েছিল মন্দারের। দাদা বারোমাস বাবা মার দেখভাল করে, সে দায়িত্বও নেহাত কম নয়, কোন মুখে দাদাকে ওই খরচের ভাগ দিতে বলে মন্দার! দাদার সামর্থ্যই বা কতটুকু! প্রাইমারি স্কুলটিচারের মাইনেই বা ক'টাকা! মা ষষ্ঠীর কৃপায় সংসারটিও তো নেহাত ছোট নয় দাদার। তিন মেয়ে, এক ছেলে। বড় মেয়েটা তো ঘাড়ের কাছে ফোঁস ফোঁস করছে, এবার তার বিয়ে দিলেই হয়।

ভাইঝির কথা মনে পড়তেই ঝিমলি ফের ঢুকে পড়ল মন্দারের ভাবনায়। পনেরো বছর ধরে লোন চলবে, পনেরো বছর পরে ঝিমলি হবে সাতাশ, এর মধ্যে তার বিয়ের কথাও তো চিন্তা করতে হবে। সে জন্যও তো কিছু সঞ্চয় চাই। কোথ্‌থেকে হবে? কী ভাবে হবে?

মন্দার ভেতরে ভেতরে সামান্য অস্থির বোধ করল। সুরভি ওপাশের খাটে পিছন ফিরে শুয়ে। সুরভির ওপারে জানলার দিকে ঝিমলি। নাইটল্যাম্পের মৃদু আলোয় বউ-মেয়েকে আবছা আবছা দেখতে পাচ্ছিল মন্দার। কেমন যেন মায়াবী. ছায়া ছায়া।

মন্দার নিচু স্বরে ডাকল,—শুনছ?

ছোট্ট উত্তর এল,—উঁ?

—জেগে আছ?

—কেন?

—একটা কথা ভাবছিলাম।

—কী?

—অনেক টাকার ধাক্কা গো। দুম করে ঝাঁপিয়ে পড়াটা কি ঠিক হবে?

সুরভি এদিকে ফিরল, মুখোমুখি হলো মন্দারের। মাঝে প্রায় হাত চারেক ব্যবধান। মেয়ে একটু বড় হওয়ার পর খাটে আর ধরে না তিনজনকে, আলমারি আর ড্রেসিং টেবিলের মাঝখানে ফোল্ডিং খাট পেতে নেয় মন্দার। সদ্য সদ্য

পাকা ড্রেন তৈরি হয়েছে বাড়ির সামনে, ইদানীং তাই মশার দাপট খানিকটা কম। ফুলস্পিডে পাখা চালালে রাত্রে আর মশারি টাঙানোর প্রয়োজন হচ্ছে না। মন্দার তবুও সুরভির মুখটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল না।

সুরভি ঈষৎ গলা ওঠাল,—এত দুশ্চিন্তা করছ কেন? টাকা তো কিছু আছে ব্যাংকে, তাই দিয়ে আপাতত বুক করে দাও।

—কতই বা আর আছে!

—পঞ্চাশ-ষাট হাজার তো আছেই। ওটাই নয় দিয়ে দাও।

—তার পর?

—কী তারপর?

—মানুষের আপদ-বিপদও তো আছে। ব্যাংক একেবারে ফর্সা করে দেব?

—আবার জমবে।

—হুঁহ্, জমবে! লোন নিলে কত করে কাটবে আন্দাজ আছে?

—সে যা কাটার কাটবে। তার মধ্যেই বাঁচাতে হবে।

—পারবে? ঝিমলির বিয়ের ভাবনাও আছে কিন্তু।

—দ্যাখো, অত ভাবলে চলে না। কবে ঝিমলি বড় হবে, কবে তার বিয়ে হবে, রাধা কবে নাচবে, ন' মণ তেল পুড়বে....! সুরভির গলা সামান্য নামল। ঘাড় ফিরিয়ে ঘুমন্ত মেয়েকে একটু দেখেও নিল যেন,—আমার তো মনে হয় ঝিমলি বড় হচ্ছে বলেই এসব আরও বেশি করে ভাবা দরকার। ছেলে-মেয়ে বড় হলে তাদের নিজস্ব কিছু কিছু প্রাইভেসি লাগে। আলাদা একটা ঘর....পড়াশুনোর জায়গা....

মন্দার চুপ করে রইল। প্রাইভেসি কি শুধু ঝিমলিরই চাই? এই যে এখন স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে চার হাতের একটা ফাঁকা জায়গা... হাত বাড়ালেও সুরভিকে ছুঁতে পারে না মন্দার, কোনও কোনও দিন গভীর রাতে দুজনকে চোরের মতো উঠে যেতে হয় ড্রয়িংরুমে, হাজার সংকোচ আর সাবধানতায় শব্দহীন মিলন...! উপায়ই বা কী? এই ওয়ানরুম ড্রয়িং-ডাইনিং-এর ভাড়াই তো সতেরোশো! নামেই ড্রয়িং ডাইনিং, প্রকৃত-পক্ষে কতটুকুই বা জায়গা সেখানে? শুধু সোফাসেট, সেন্টার টেবিল আর টিভি-টেপ রাখার ক্যাবিনেটেই তো বসার জায়গাটুকু জবরজং। ডাইনিং-এর জায়গায় চার জনের খাবার টেবিল, ফ্রিজ আর ওয়াটার ফিল্টার রাখার পর নড়াচড়া করার রাস্তাই নেই। এই ফ্ল্যাটই মন্দাররা ছেড়ে দিলে কম করে তিন হাজারী হবে। হবেই। বাসস্ট্যান্ডে সুপারমার্কেট গড়ে ওঠার পর হু হু করে দর বেড়েছে এ অঞ্চলের, এখানে ভাড়া নিয়ে টিকে থাকতে হলে ওসব প্রাইভেসি-টাইভেসির কথা মাথায় আনলে চলবে না।

মন্দার চিত হয়ে শুয়ে ছিল। সুরভি আবার বলল,—এখানে এখন ফ্ল্যাটের কত করে রেট যাচ্ছে জানো? এই তো বাজারের পাশে যেটা উঠছে, মিসেস রায়রা বুক করেছেন, সাড়ে নশো টাকা স্কোয়্যার ফিট। সেই জায়গায় তুমি পাচ্ছ সাড়ে আটশোয়। ওটা ছাড়ার কথা ভাবা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

—হুম্, তা বটে। মন্দার চুলে আঙুল চালাল। দশ আঙুল ডুবিয়ে আগা থেকে গোড়া অবধি ছুঁয়ে যাচ্ছে,—নন্দী এত কমে দিচ্ছে কী করে এটাই তো রহস্য।

—নিশ্চয়ই ওই মহিলা আর মহিলার ভাইঝিকে ঠকাচ্ছে।

—সে সব প্রোমোটারই ঠকায়।........কিন্তু আমাদের সস্তায় দিচ্ছে কেন? মাল মেটিরিয়াল সব ঠিকঠাক দেবে তো? দু'দিন পরে হয়তো দেখলাম দরজার পাল্লা খুলে বেরিয়ে গেল, সিলিং ফেটে চাবড়া ঝুলছে....

—তোমার আবার বেশি বেশি। সব সময়ে শুধু নেগেটিভ চিন্তা।....তুমিই তো বলছিলে ওই সুব্রত নাকি একসময়ে পার্টি-ফার্টি করত?

—ওই জন্যই তো আরও বেশি ভয়।

—উল্টোও তো হতে পারে। একেবারে ফেরেববাজ বনতে হয়তো এদের বিবেকে বাধবে।

—ভাল হলেই ভাল।

—দোনামোনা কোরো না। ডিসিশান যখন নিয়েই ফেলেছি। পরে যা হবে দেখা যাবে। আমাদের থেকেও কত হার্ড সিচুয়েশানে থেকে সব লড়ে-টড়ে বাড়ি করে ফেলছে....। আমাদের অফিসের হীরেনবাবু....তাঁর তো একার রোজগার....দিব্যি সোনারপুরে জমি কিনে টুকটুক করে বাড়ি করে ফেললেন। আমরা তো বাড়ির ঝামেলাতেও যাচ্ছি না, এটুকু রিস্ক না নিলে চলে? তোমার অফিসের দেবদত্তও তো....।

সুরভি উঠে বসল। মাথার কাছে বেঁটে টুলে জল রাখা আছে, গলায় ঢালল একটু। পাখার নিচেও ঘামছে বোধহয়, ঘাড়-গলা মুছছে আঁচলে। বালিশ থেকে মাথা সরে গেছে ঝিমলির, ঠিক করে দিল সন্তর্পণে।

ছোট্ট একটা হাই তুলে বলল, —তবে হ্যাঁ, এখন থেকে আমাদের একটু সমঝে বুঝে চলতে হবে। তোমার বাবুয়ানি আর চলবে না।

—আমার? আমি কী বিলাসিতা করি?

—খাওয়ার বিলাসিতা নেই তোমার? কথায় কথায় ভেটকি চিংড়ি পাবদা মাটন...! টাকা অ্যাডভান্স করার পর একদম বাজেট করে চলতে হবে। সপ্তাহে তিনদিন মাছ, একদিন ডিম, একদিন মুরগি, বাকি দু'দিন প্লেন নিরামিষ।

—ঝিমলির নিরামিষ রুচবে?

—বাবার রুচলেই মেয়ের রুচবে। ....ঝিমলি মোটেই অবুঝ নয়, ওকে বোঝালে নিশ্চয়ই বুঝবে।

—পেটে কিল মেরে ফ্ল্যাট?

—ওভাবেই করতে হয়। সবাই তাই করে।...হীরেনবাবুকে আমি কখনও মুড়ি-বাদাম ছাড়া টিফিন করতে দেখিনি।

—বেশ তো, তোমার শখশৌখিনতাগুলোও কমিয়ো তাহলে। পনেরো দিন বম্বে গোয়া ট্যুর, চোদ্দ দিন কুলু মানালি, এবারে আরাকু তো ওবারে পেলিং, সমস্ত এখন শিকেয় তুলে রাখতে হবে।

—রাখব। আমি সব পারি। তুমি এখন শুধু জয়দুর্গা বলে বুকিংটা করে ফেলো।

—বলছ?

—ওফ্, এখনও দ্বিধা? তোমায় নিয়ে আর পারা যায় না।

সুরভি উঠে দাঁড়াল। বাথরুমে যাবে। যাওয়ার সময়ে বেশ কয়েকদিন পর আলগোছে একটু আদর করল মন্দারকে।

মন্দারও হাত বাড়াতে যাচ্ছিল, ঝিমলি নড়েচড়ে উঠেছে বিছানায়। মন্দার চোখ বুজে ফেলল।

(চার)

কুড়িয়ে কাঁচিয়ে পঁয়ষট্টি হাজার টাকা সুব্রত নন্দীকে দিয়ে দিল মন্দার। দিন সাতেকের মধ্যেই। সুব্রত চাইছিল পঁচাত্তর, তবে পঁয়ষট্টি পেয়েও সে খুব অখুশি নয়। এক ধাক্কায় স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই ব্যাংক প্রায় শূন্য। তা হোক মন্দার আর এই নিয়ে ভাববে না। সে এখন অনেকটাই নিশ্চিন্ত। নির্ভার। মাথা গোঁজার একটা আশ্রয় তো হচ্ছে।

ফ্ল্যাট বুক করেই মন্দারের হাঁটা-চলা বদলে গেছে যেন। একটা অদ্ভুত ধরনের ব্যক্তিত্ব এসেছে তার মধ্যে। আগে মিনিবাসে কেউ পা মাড়িয়ে দিলে মন্দার বড় জোর তার দিকে কটমট করে তাকাত, এখন মন্দার তার চোখে চোখ রেখে ঝগড়া করতে পারে। অফিসে ইদানীং এক কাঁচাখেকো জি-এম এসেছে শিলিগুড়ি থেকে, তার দাবড়ানির দাপটে সকলেই থরহরি কম্পমান। মন্দারও তার চেম্বারে ঢুকতে এতটুকু স্বচ্ছন্দ বোধ করত না, অথচ এখন সে দিব্যি মাথা তুলে বসের সঙ্গে কথা বলতে পারে। ছুটির পর রিক্রিয়েশান রুমে ব্রিজ খেলার একটা আড্ডা বসে রোজ, মন্দারেরও অল্পস্বল্প নেশা আছে তাসের, প্রায়ই দীপক সান্যালের পার্টনার হয় মন্দার। হ্যান্ডপ্লেটা ভাল আসে না মন্দারের, আর ভুল খেললেই

হলো, দীপক সান্যাল চিল্লানো শুরু করবে। দীপকদার মুখকে মন্দার খুব ডরায়। থুড়ি, ডরাত। কিন্তু সেদিন সাফ সাফ মুখের ওপর বলে দিল, আপনিই তো কলে ভুল করেছেন, ওই সময়ে এস্ আস্কিং হয়? বারো পয়েন্ট হাতে নিয়ে আপনি বিড ওপেন করেছিলেন কেন? পাল্টা দাবড়ানিতে দীপক সান্যাল কেঁচো, মিউ মিউ করছে।

এই বদলটা মন্দার নিজেও অনুভব করছে বেশ। কিন্তু কারণটা ঠিক ঠাহর করতে পারছে না। ভাড়াবাড়িতে বাস করতে করতে কি তার মধ্যে হীনমন্যতা জন্মে গিয়েছিল? সুব্রত নন্দীকে অগ্রিম ধরিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে কি ভাবতে শুরু করেছে সে একখানা আস্ত ফ্ল্যাটের মালিক? ভাড়াবাড়িতে বাস শেষ হওয়ার আগেই কি এমনটা ঘটা সম্ভব? নাকি বাড়িওয়ালাদের চোখরাঙানি থেকে মুক্তি পেতে চলেছে এই ভাবনাটাই তার মধ্যে এক ধরনের জোর তৈরি করে দিয়েছে?

একেই কি আত্মবিশ্বাস বলে?

এই তো পরশুদিন দুম করে দিব্যেন্দুর অফিসে চলে গেল মন্দার। বহুকাল পর। দিব্যেন্দু মন্দারের একেবারে ছেলেবেলার বন্ধু, এক গ্রামেই থাকত। কিন্তু ইদানীং দিব্যেন্দুকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলত মন্দার। দিব্যেন্দু এখন মস্ত অফিসার, আর সে আধা সরকারি অফিসের ঊর্ধ্বতন কেরানি—ফ্ল্যাট গাড়ি সুন্দরী স্ত্রী শোভিত দিব্যেন্দুর কাছে যেতে মন্দার রীতিমতো সংকোচ বোধ করত।

দিব্যেন্দুর ঝাঁ-চকচক চেম্বারে ঢুকে অবলীলায় সস্তা দামের সিগারেট ধরিয়েছিল মন্দার। কায়দা করে বলেছিল,—কী রে, আছিস কেমন?

দিব্যেন্দু কি অতশত খেয়াল করেছিল? মনে হয় না। বন্ধুকে দেখে সে যথেষ্ট উত্তেজিত। বলেছিল—আয় আয়, অ্যাদ্দিন ডুব মেরেছিলি কোথায়?

মন্দার কাঁধ ঝাঁকিয়েছিল,—খুব চাপে থাকি রে। সময় করতে পারি না।

—কেন, অফিস খুব যাঁতা দিচ্ছে বুঝি?

—দূর, অফিস তো অফিসের মতোই চলে। বলেই রহস্য ফাঁস করার ভঙ্গিতে বলে উঠেছিল মন্দার,—একটা ফ্ল্যাট বুক করে ফেললাম। ওই নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলাম ক'দিন।

—ইজ ইট? বাহ্ বাহ্, দারুণ খবর। পুরোন বন্ধুরা থিতু হয়েছে দেখলে আমার যা ভাল লাগে না! দিব্যেন্দুর মুখে অবিমিশ্র খুশির ঝলক,—কোথায় বুক করলি?

সেলিমপুরের ভেতরে—বলতে গিয়েও বলল না মন্দার। কায়দা করে বলল,—যোধপুর পার্কের কাছেই।

—যোধপুর পার্ক? সে তো বেশ রইস জায়গা রে।

—গিন্নির ওদিকটাই পছন্দ।

—সাইজ কি রকম?

—আমি তো তোর মতন রিচ ম্যান নই। এবারও একটু ছলনার আশ্রয় নিল মন্দার,—হাজারের নিচে, তবে মোটামুটি খারাপ নয়। আমাদের তো ছোট ফ্যামিলি, খুব বেশি বড় নিয়ে কীই বা করব বল্?

—বটেই তো।

কেন যে সঠিক মাপটা মুখে আনতে পারল না মন্দার? এ'ই বা কোন ধরনের হীনমন্যতা?

পরে বেরিয়ে মন্দারের একটু খারাপই লেগেছিল। দিব্যেন্দু যদি কখনও তার ফ্ল্যাটে যায়, মনে মনে নিশ্চয়ই হাসবে। এক অসফল বন্ধু সামান্য একটা পায়রার খোপ কিনেই তার সমকক্ষ হওয়ার স্পর্ধা দেখাচ্ছে, এমনও তো ভাবতে পারে দিব্যেন্দু।

তবে এক জায়গায় রঙ চড়িয়ে বলে মন্দার সত্যিই মানসিক তৃপ্তি পেয়েছে।

ইদানীং ঝিমলির হাত দিয়ে খামে করে বাড়িওয়ালাকে ভাড়াটা পাঠিয়ে দিত মন্দার। এবার মাসপয়লায় সে নিজেই গিয়েছিল। টাকাটা অবিনাশ হালদারের হাতে দিয়ে মেজাজে জিজ্ঞেস করেছিল,—আপনার বাড়ি ছাড়ার আগে ক'মাসের নোটিস দিতে হবে অবিনাশবাবু?

অবিনাশ চমকে ছিল সামান্য। পরমুহূর্তেই ভুরু কুঁচকে জবাব,—সে তো এগ্রিমেন্টেই লেখা আছে।

—পুরো টাকাটা কিন্তু আপনি কাটাননি। পাঁচ হাজার সিকিউরিটি ডিপোজিট রেখে দিয়েছেন। আশা করি নোটিস দিলে এক মাসের মধ্যে টাকাটা পেয়ে যাব।

অবিনাশগিন্নি কৌতূহল চাপতে পারেনি। পাশ থেকে বলে উঠেছিল,—সত্যি সত্যি আপনারা চলে যাচ্ছেন?

—আর পোষাচ্ছে না।

—কোথায় বাড়ি পেলেন?

—বাড়ি নয়। ফ্ল্যাট। কিনছি।

—তাই নাকি? অবিনাশগিন্নির চোখ জ্বলজ্বল,—খুব ভাল। খুব ভাল।

—ভাল-মন্দ জানি না। আর ভাড়াবাড়িতে থাকতে হবে না, এটাই সবচেয়ে বড় প্লাস পয়েন্ট।

কথার ঠেসটা বেমালুম হজম করে নিল স্বামী-স্ত্রী। অবিনাশ হাসিমুখেই জিজ্ঞেস করল,—কোথায় কিনলেন?

—খুব দূরে নয়, চন্দনপুকুর পার্কের পাশে।

—কী রকম পড়ল?

—অ্যারাউন্ড নাইন। সব মিলিয়ে দশ লাখ পড়ে যাবে।

—এত? বড় ফ্ল্যাট কিনছেন?

—চিরকালই কি ঘুপচি ঘরে থাকব? এবার একটু আরাম করে থাকা যাবে। পূর্ব-দক্ষিণ খোলা তিনতলার ফ্ল্যাট, বুঝতেই পারছেন...

অবিনাশ হালদারের ভুরু আরও জড়ো হচ্ছিল। যেন তার বাড়িতে সতেরোশো টাকা ভাড়া দিয়ে বসবাস করা কোনও ভাড়াটের দশ লাখে ফ্ল্যাট কিনে ফেলা বেশ গর্হিত কাজ। যেন দামী ফ্ল্যাট কেনার জন্যই তাকে কম ভাড়া দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে টাকা জমিয়েছে ভাড়াটে! হয়তো বা মানেও লাগছিল। নিজের বাড়িকে ঘুপচি শুনতে কোন বাড়িওয়ালা ভালবাসে?

অবিনাশকে আরও একটু তাতানোর জন্য মন্দার ইচ্ছে করে বলল,—গৃহপ্রবেশের দিন আপনারাও যাবেন। অ্যাডভান্স নেমন্তন্ন রইল।

অবিনাশ ভাবলেশহীন গলায় জিজ্ঞেস করেছিল,—কবে যাচ্ছেন?

—ফ্ল্যাট তৈরি হয়ে গেলেই যাব।

—মানে? রেডি ফ্ল্যাট নয়?

—না। আন্ডার কন্সট্রাকশান। বুকিংটা সেরেই আপনাদের জানিয়ে দিলাম। ভাবলাম, আপনারা নিশ্চয়ই শুনে আহ্লাদিত হবেন।

টিপ্পনীটা যেন গায়ে বিঁধল না অবিনাশের। মনে হয় বেশ হতাশ হয়েছে। হোক গে, মন্দার পাত্তা দেয়নি।

অবিনাশ হালদার চটল, কি ব্যথিত হলো তাতে ভারী বয়েই গেল মন্দারের। শালা অবিনাশ নির্ঘাৎ মনে মনে হিসেব শুরু করে দিয়েছে মন্দাররা উঠলে এবার কত ভাড়া হাঁকা যায়। সঙ্গে কত মোটা অ্যাডভান্স।

ভাবুক, ভাবতেই থাকুক। তবে লোকটা এখন কিছুদিন আর ঘাঁটাবে না মন্দার-সুরভিকে। ফ্ল্যাট বুক করার এটাও তো একটা প্লাস পয়েন্ট।

(পাঁচ)

—বাবা, দেখেছ মার কাণ্ড?

—কী হয়েছে?

—মা আবার পড়াশুনো শুরু করেছে। হিহি।

মন্দার অফিস থেকে ফিরে শার্ট ছাড়ছিল, অবাক চোখে দেখল সুরভিকে। সত্যিই তো, বিছানায় বসে কাগজ-ডটপেন নিয়ে কী করছে সুরভি?

চোখ ঘুরিয়ে মন্দার জিজ্ঞেস করল,—কী করছ তুমি?

সুরভির আগে ঝিমলির জবাব,—ইন্টিরিয়ার ডেকরেশান।

—মানে?

—তুমি তো ক'দিন ধরে দেরি করে ফিরছ, তাই দ্যাখোনি....মা এখন রোজ অফিস থেকে এসেই নক্‌শা আঁকতে বসে যায়।

—কিসের নক্‌শা?

—ফ্ল্যাটের। মানে আমাদের ফ্ল্যাটের কোন ঘরে কী থাকবে, লিভিংরুম কেমন ভাবে সাজানো হবে....। ঝিমলি ঝপ করে একখানা কাগজ টেনে মন্দারকে বাড়িয়ে দিল,—এই দ্যাখো, কত ভাবে ফ্ল্যাটটাকে ডেকরেট করছে মা।

সুরভি একটু অপ্রস্তুত যেন। হাসল লাজুক মুখে,—খারাপটা কী করছি? যেখানে বাকি জীবনটা কাটাতে হবে, সেটাকে একটু সাজানো গোছানোর কথা ভাবব না?

মন্দার কাগজটা দেখছিল। কত রকম ভাবে যে ছবি এঁকেছে সুরভি। কোথাও শুধুই আলাদা ভাবে মাস্টার বেডরুমখানা, কোথাও বা আলাদা করে শুধুই দুটো বেডরুম। ড্রয়িং-কাম-ডাইনিং স্পেসটাকেও ভাগ করেছে নানান সাইজে। খাটের মাপ ফেলেছে কোনও নক্‌শায়, কোথাও বা চৌকো চৌকো করে আলমারি ওয়ার্ড্রোব ড্রেসিং টেবিল আঁকা। ক্যাবিনেট, সোফাসেট, ডাইনিংটেবিল, ফ্রিজ, রুমির পড়ার টেবিল, সবই সাজিয়ে ফেলেছে কালির আঁচড়ে।

মন্দার হাসতে গিয়েও হাসতে পারল না। দেখতে দেখতে সেও কেমন যেন নক্‌শার মধ্যে ঢুকে পড়ছিল। কাগজটা হাতে নিয়েই বসল বিছানায়। সিরিয়াস মুখে বলল,—ড্রয়িংরুমের জন্য একটু বেশি জায়গা ছাড়া হয়ে গেল না?

—উপায় নেই। আমি অনেক হিসেব করে দেখেছি....সদর দরজার জন্য তিন ফুট বাদ গেলে বসার জায়গার চওড়াটা হয় মাত্র ছ'ফুট। ধরো লম্বাটা রইল দশ ফুট, মানে শোওয়ার ঘরের দরজার আগে পর্যন্ত বসার জায়গার জন্য আমরা পাচ্ছি দশ বাই ছয়। এইটুকু জায়গায় তুমি কোথায় কী রাখবে বলো? ক্যাবিনেট নিশ্চয়ই তুমি বেডরুমে নিয়ে গিয়ে ঢোকাবে না।

—কিন্তু এদিকটা বেশি রাখলে তোমার খাওয়ার জায়গা তো ছোট হয়ে যাচ্ছে।

—খুব ছোট হবে না। মোটামুটি নয় বাই নয় মতো পাব।

—কিন্তু মা, ওদিকেও তো খানিকটা জায়গা তোমায় বাদ দিতে হবে।

—কেন?

—বা রে, হাঁটাচলার জন্য জায়গা ছাড়তে হবে না? মন্দার কাগজটায় ঝুঁকল আর একটু,—তারপর দ্যাখো, তোমার ব্যালকনিতে যাওয়ার দরজাও পড়ছে ডাইনিং-এর দিকে, সেখানেও খানিকটা জায়গা খাবে।

—তাতে কী আছে? ওর মধ্যেই ধরে যাবে।

—অসম্ভব। ধরতেই পারে না। তোমার ডাইনিং টেবিলের সাইজ কী আছে একবার ভাবো।

—ও আমার ভাবা হয়ে গেছে। ওটা আমি একটা কায়দা করব।

—কী রকম?

ঝিমলি মুচকি হাসল,—ওই ডাইনিং টেবিলটা বাতিল হয়ে যাচ্ছে বাবা। মা বলছিল পার্ক স্ট্রিটের কোন্ অকশন শপে ডিম সেপের টেবিল দেখে এসেছে, চেপে চেপে বসলে স্বচ্ছন্দে সেখানে ছ'জন বসতে পারবে।

সুরভির ঠোঁটে গর্বিত হাসি,—এটা সিম্পল্ ম্যাথ্মেটিক্স মশাই। রেক্টাংগ্লের থেকে ইলিপ্টিকাল শেপের টেবিল হলে ঘরদোরের জায়গা অনেক কম নষ্ট হয়।

—হুম্।—মন্দার রসিকতা জুড়ল,—অঙ্কে তোমার এত মাথা জানা ছিল না তো!

—তুমি আমার কতটুকু জানো? সুরভি হাঁটু মুড়ে গুছিয়ে বসেছে,—এ ক'দিনে কটা নিলামঘরে ঘুরেছি সে খবর রাখো? নতুন সোফা দেখেছি, দারুণ স্লিক। আমাদের ওই পুরোন ঢাউসটা আর রাখব না।

—ওটা আমারও প্ল্যান।...তবে সোফা আর না কিনে অন্য কোনও কায়দা করা যায় না? আজকাল তো বেশ সুন্দর সুন্দর বেঁটে বেঁটে বেতের চেয়ার বেরিয়েছে। আর মাঝখানটায় ধরো কাচ বসানো ছোটখাটো সেন্টারটেবিল। ওতে বসার জায়গাটা বেশ ছিমছাম লাগবে।

ঘরের সাজসজ্জার ব্যাপারে মন্দারের সঙ্গে সুরভির ঘোর অমিল। তবে এই প্রস্তাবটা সুরভি এক কথায় উড়িয়ে দিল না। চোখ কুঁচকে ভাবল একটু। তারপর বলল,—সেটা অবশ্য করা যায়, তবে একটু ন্যাড়া ন্যাড়া লাগবে।

ঝিমলি বলল,—দেওয়ালের ধারে ছোট একটা ডিভান রেখে কুশন দিয়ে সাজিয়ে দাও, তাহলে আর....। দেবমিতাদের বাড়িতে দেখেছি। দারুণ কালারফুল লাগে।

মন্দার বলল,—তার মানে আবার একটা ডিভান কিনতে হবে বলছিস?

—অনেক কিছুই কিনতে হবে। সুরভি ঘাড় দোলাল,—কাল একটা বিউটিফুল স্ট্যান্ডল্যাম্প দেখেছি। কাঠের। ঠিক ওই প্যাটার্নের একটা আমি বাইরের ঘরে রাখবই। কিচেনটাকেও সুন্দর করে ফারনিশ করতে হবে। কাবার্ড বানাব, একটা-দুটো ওয়ালফিটিং থাকবে, ভাল বাসনকোসনের জন্য গ্লাসের হ্যাংগিং শোকেস....

মন্দারের এতক্ষণে ঘোর কেটেছে। হেসে ফেলল,—লিস্ট তো তোমার বেড়েই যাচ্ছে ক্রমশ। এত যে কিনবে প্ল্যান করছ, তার টাকা আসবে কোথ্থেকে? ওটি কিন্তু আসমান থেকে ঝরবে না।

—সব হয়ে যাবে। তুমি কেঁদো না তো। লাখ লাখ টাকা খরচা করে বাড়ি কিনতে পারছি, আর কটা টাকা যোগাড় করে মনের মতো ফার্নিচার আনতে পারব না? বলতে বলতে সুরভি ফের আঁকায় ঝুঁকেছে। ডটপেন নেড়ে বলল,—এদিকে তাকাও, দ্যাখো এই কাগজটায় আমি কীভাবে সব সেট করেছি। ক্যাম্পখাট ঝিমলির ঘরে ট্রান্সফার হয়ে যাবে। ড্রেসিংটেবিলটাও। কিম্বা একটা সিঙ্গল খাট কিনে দেব ঝিমলিকে, ক্যাম্পখাট অতিথি-টতিথিদের জন্য তোলা থাকবে। বড় আলমারি যাবে আমাদের ঘরের বাঁ দিকের দেওয়ালে, ছোট আলমারি থাকবে ঝিমলির টেবিলের পাশে। ....আমাদের ঘরের জন্য ওয়ালফিটিং ড্রেসিংটেবিল বানিয়ে নেব। একটা আয়না দুটো র‍্যাক...

মন্দার আলতো চোখ বোলাল সুরভির অন্য নক্শায়। তালিকা যেভাবে লম্বা হচ্ছে...মানে আরও লাখ খানেকের ধাক্কা। তবে এই মুহূর্তে ওই চিন্তায় নতুন করে পীড়িত করতে চাইল না সুরভিকে। হয়তো বা নিজেকেও। এমন সময়ে মানুষ সব কিছুই ঈশ্বরের ভরসায় ছেড়ে দেয়।

হাসিটাকে মুখে ধরে রেখেই মন্দার বলল,—এখন কি তোমার শুধু ইন্টিরিয়ার ডেকরেশানই চলবে? নাকি একটু চা-ফা পাব?

—হচ্ছে।....তুমি বাথরুম থেকে ঘুরে এসো।

—শুধু চা দিও না কিন্তু।

—আবার কী খাবে এখন? পৌনে আটটা বাজে, একটু পরেই তো.....।

—পেট চুঁইচুঁই করছে। সেই কখন টিফিন করেছি।

—চিঁড়েভাজা দেব? সঙ্গে বাদাম?

—যাহ্ বাবা! অফিসেও চিঁড়ে-বাদাম, বাড়িতেও চিঁড়ে-বাদাম...! মন্দার মুখে একটা ছদ্ম করুণ ভাব আনল,—তোমার ফ্ল্যাটের জন্য এখন থেকেই এত কৃচ্ছ্রসাধন করতে হবে?

—ওফ্, প্যাখনা আছে বটে ষোল আনার ওপর আঠেরো আনা। সুরভি ভ্রূভঙ্গি করল। বিরক্তির নয়, বাচ্চাদের ছেলেমানুষি দেখে বড়রা যেমন করে, অনেকটা যেন সেই রকম। খাটে ছড়িয়ে রাখা খণ্ড খণ্ড ফ্ল্যাটগুলোকে গুছিয়ে তুলছে। টেবিলের ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রেখে স্মিত মুখে বলল,—ডিমভাজা চলবে?

—দৌড়বে।

ঝিমলি বিছানায় উপুড় হয়েছে। বই উল্টোতে উল্টোতে বলল,—আমিও কিন্তু একটা ওমলেট খাব মা।

—উঁউঁম্, ওমনি বাপের পোঁ ধরল! সুরভি চোখ ঘোরাল,—এমন করলে কিন্তু ফ্ল্যাট ট্ল্যাট আর হচ্ছে না।

—যাহ্ বাবা, মাত্র একটা ওমলেটের জন্য আস্ত ফ্ল্যাট বাতিল? খাস না রে ঝিমলি।

একসঙ্গে হেসে উঠল তিনজনে। হাসিটাকে নিয়েই রান্নাঘরে চলে গেল সুরভি। মেয়ের সঙ্গে একটু খুনসুটি করে মন্দারও বাথরুমে।

আজ মন্দারের সন্ধেটা সত্যিই ভাল। বাথরুমে অঢেল জল। পাছে না থাকে সেই ভয়ে প্লাস্টিকের বালতিগুলোও ভরে রেখে গেছে সুবালার মা। অবশ্য মন্দারের আজ স্নানের স্পৃহা নেই। বর্ষা এসে গেছে, আষাঢ়ের গোড়ায় ক'দিন বৃষ্টিতে ভিজে মন্দারের সর্দিকাশি হয়েছিল জোর, তারপর থেকে সে একটু সাবধানে সাবধানে থাকছে। নিয়মিত সান্ধ্য অবগাহন আপাতত স্থগিত।

ভাল করে মুখে-চোখে জল ছেটাচ্ছিল মন্দার। আপন মনে, শিস দিতে দিতে। হঠাৎই কানে এল রান্নাঘরে গান গাইছে সুরভি। মন্দার হেসে ফেলল। বাড়ির পরিবেশটা যেন বেশ উজ্জ্বল হয়ে গেছে। অনেককাল পর বাড়িতে সুরভির গানও শোনা গেল। কী চমৎকার গলা সুরভির, কেন যে গায় না!

ছোট ছোট স্মৃতি মনে পড়ছিল মন্দারের। সুরভির সঙ্গে প্রথম আলাপ, একটু একটু করে ঘনিষ্ঠ হওয়া.....। চাকরিতে যোগ দেওয়ার বছর খানেক পর দল বেঁধে বেড়াতে যাওয়া হয়েছিল বকখালি। মূলত অফিস-কলিগরাই ছিল গ্রুপে, অনেকে ফ্যামিলিও নিয়ে গিয়েছিল। সহকর্মী সোমেশের বোনের বান্ধবী ছিল সুরভি, সেও ছিল সেবার। যাওয়ার পথে বাসেই পরিচয়, সমুদ্রতীরে জানাজানিটা একটু গাঢ় হয়েছিল। ফেরার পরেও সুতোটা ছেঁড়েনি, বরং তারা আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে দিনে দিনে। তখন এম-এ পড়ছিল সুরভি, প্রায় রোজই ইউনিভার্সিটি পালিয়ে চলে আসত ডালহাউসিতে, সেখান থেকে দুজনে মিলে সোজা গঙ্গার ধার। জাজেস্ ঘাটের আগে একটা বেদি তো প্রায় তাদের জন্য সংরক্ষিতই হয়ে গিয়েছিল সে সময়ে। আঁধার নামলেই একটার পর একটা গান শোনাত সুরভি। নিচু গলায়, গুনগুন করে। ছোট ছোট ঢেউ তুলে নদী বয়ে চলেছে সামনে দিয়ে, নদীর ওপারে ঝলমল করছে আলোকমালা, বাতাস বইছে, সঙ্গে সুরভির গান—কেমন যেন অপার্থিব হয়ে উঠত সন্ধেগুলো।

বিয়ের পরেও তো কত রাত সুরভি গান শুনিয়েছে মন্দারকে। কী মধুর যে ছিল সেই দিনগুলো! কবে থেকে গান বন্ধ হয়ে গেল সুরভির? চাকরিতে ঢোকার পর থেকেই কি? সংসারের চাপে পড়ে?

চাকরি করার তেমন ইচ্ছে ছিল না সুরভির। খানিকটা বাধ্য হয়েই শুরু করেছিল। অফিস থেকে রিটায়ার করার আগেই দুম করে একদিন গত হলেন সুরভির বাবা। তিনি ছিলেন একটু ভালমানুষ, নির্বিরোধী ধরনের। দারুণ রগুড়ে, মজার মজার গল্প বলতেন, যে কোনও আসর মাতিয়ে রাখতেন একাই। মেয়ের

সঙ্গে ডুয়েট গাইবেন এই দাবি তুলে। কিন্তু তিনি সংসারী হিসেবে একদমই গোছানো স্বভাবের ছিলেন না। বাবার মৃত্যুর পর সুরভি আবিষ্কার করল তাঁর একটা এল-আই-সি পর্যন্ত নেই। চাকরি করতেন বেসরকারি দপ্তরে, তাঁর মৃত্যুর পর সুরভির মার কপালে বিশেষ কিছুই জুটল না, বলতে গেলে প্রায় অকূল পাথারে পড়লেন সুরভির মা। প্রথম প্রথম মন্দার-সুরভি তাঁকে নিজেদের কাছে এনে রেখেছিল। কিন্তু সুপ্রভার আত্মসম্মানবোধ অত্যন্ত প্রখর, সংস্কারেও বাধছিল, মেয়ে জামাই-এর সংসারে তিনি কিছুতেই থাকবেন না। এমনকি জামাই-এর কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নিতেও তিনি রাজী নন। উপায়ান্তর না দেখে সুরভি তখনই ট্রাভেল এজেন্সির চাকরিটা জোটাল। সুরভির টাকা নিতেও কি সহজে সম্মত হয়েছিলেন সুপ্রভা? মোটেই না। কত বুঝিয়ে-বাঝিয়ে, চেঁচামিচি রাগারাগি করে তবে যে সুরভি তাঁকে বাগে এনেছে।

ওরকম একটা আতান্তরে পড়েই কি সুরভির গলা থেকে গান হারিয়ে গেল? নাহ্, ঠিক তাও নয়। সংসারের অবিরাম চাপ, সারাদিনের অক্লান্ত খাটুনি, তার পরেও টুকটাক ছোটখাটো সাংসারিক ঝামেলা, সবার ওপরে কোথাও একটা পাকাপাকি থিতু হতে না পারার চোরা উদ্বেগ সুরভিকে ক্রমশ নীরস করে দিচ্ছিল। শুধু একটুখানি আশার আলো দেখেই কী ভীষণ খুশি এখন মন্দারের বউটা। মনমেজাজই কত অন্যরকম হয়ে গেছে।

সুরভি রোজগারপাতি করতে বেরোক এটা মন্দারও চায়নি প্রথমে। বউ মানে তার কাছে ছিল একেবারেই একটা ঘরোয়া কিছু। যে রাঁধবে বাড়বে, বাচ্চা মানুষ করবে, সন্ধেবেলা স্বামী ঘরে ফিরলে মুখে হাসি নিয়ে দরজাটি খুলে দেবে, একান্ত ভাবে নির্ভর করবে স্বামীর ওপর।

এমনটা শেষ পর্যন্ত হলো না বলে মন্দারের মনে কি ক্ষোভ আছে খুব? না। অন্তত এখন তো আর নেইই। আজকে যে এই ফ্ল্যাট কেনার কথা ভাবছে, সুরভির চাকরিটা না থাকলে ইচ্ছেটাকে কি সেভাবে প্রশ্রয় দিতে পারত মন্দার? তাছাড়া চাকরি করতে বেরিয়ে সুরভির বহু পরিবর্তনও হয়েছে, এবং তার বেশির ভাগটাই ভালর দিকে। আগে সুরভি বড্ড বেশি কল্পনাপ্রবণ ছিল, সংসারের জটিল মারপ্যাঁচ ততটা বুঝত না। এখনও স্বপ্ন স্বপ্ন ভাবটা যায়নি যদিও, তবে বাস্তববোধ অনেক বেড়েছে। হিসেবীও হয়েছে যথেষ্ট। যে কোনও কাজেই এখন সুরভির মতামতের ওপর বেশ আস্থা রাখতে পারে মন্দার। বুঝি বা খানিকটা নির্ভরও করে।

এই তো, গত বুধবার অফিস থেকে ফিরে মন্দার বলেছিল,—এই জানো, আজ ব্যাংকে গিয়েছিলাম। আলোচনা করলাম ম্যানেজারের সঙ্গে।

সুরভি তখন রাতের আটা মাখছিল। সুবালার মা রান্নাটা করে রেখে যায়,

সুরভি ফিরে রাতের ভাত-রুটিটা করে। ভাত-রুটি গরম গরম না হলে মন্দার-ঝিমলি খেতে পারে না।

কাজ থামিয়ে উদগ্রীব প্রশ্ন করেছিল সুরভি,—ম্যানেজার কী বললেন? লোন পাওয়া যাবে তো?

—বললেন তো হয়ে যাবে। কিন্তু.....

—কী কিন্তু?

—ওরা দেয় টেক-হোম পে'র ছত্রিশ গুণ। আমার তো কেটেকুটে হয় সওয়া নয়....তার মানে তিন লাখ দশ-বিশ হাজার মতো পাব। মন্দার চিন্তামাখা মুখে বলেছিল,—বুঝতেই পারছ, কিছুটা ডেফিসিট হয়ে যাবে।

—তোমার আমার মিলিয়ে জয়েন্ট লোন হয় না?

—বলেছিলাম। গাঁইগুঁই করছে। ....তোমার অফিসটা তো একেবারেই প্রাইভেট... বলছে আরও কিছু সিকিউরিটি লাগবে।

—তা ব্যাংক ছাড়া অন্য কোথাও থেকে চেষ্টা করা যায় না? এল-আই-সি টেল-আই-সি?

—ওদের তো আবার পলিসি করতে হবে।

—আমাদের তো আছে পলিসি।

—সে তো মাত্র আশি হাজারের। তার এগেন্স্টে কি সাড়ে তিন লাখ দেবে? এমনিই তো ব্যাংক বলছিল যে পলিসিটা আছে, সেটাও জমা রাখতে হবে।

—তাহলে?

—ভাবছি।....তিরিশ-চল্লিশ হাজার শর্ট পড়ে যাওয়া কম কথা নয়।

—এক্ষুনি এক্ষুনি তো দিতে হচ্ছে না। এর মধ্যে যদি আরও কিছু জমাতে পারি....। সুরভি একটু ভেবে নিয়ে বলল,—তেমন তাড়া থাকলে অন্য রাস্তাও আছে।

—কী রাস্তা?

—আমার গয়নাগুলো বেচে দেব। নয় নয় করে দশ-বারো ভরি তো আছেই।

—যাহ্ তা হয নাকি! মন্দার সঙ্গে সঙ্গে নাকচ কবতে চেয়েছিল,—ঝিমলির বিয়ে দিতে হবে না?

—আবার সেই ঝিমলির বিয়ের চিন্তা? সুরভি চোখ পাকিয়েছিল,—ঝিমলির বিয়ের না হোক এখনও এক যুগ দেরি। এর মধ্যে ঠিক আস্তে আস্তে সব গড়িয়ে ফেলব।

—পারবে? সওয়া তিন লাখ ধার নিলে মাসে মাসে কত কাটবে জানো? প্রায় সাড়ে তিন হাজার।

—কী এমন? ভাড়ার টাকাটা তো লাগবে না। বড় জোর হাজার দুয়েক

টাকা খরচা বাড়বে। ওটা কোনও না কোনও ভাবে ঠিক ম্যানেজ হয়ে যাবে, দেখো।

—তোমার নিজের বলতে কোনও গয়না কিন্তু আর থাকবে না।

—তো?...নয় পরব না গয়না। বিপদ-আপদে কাজে না লাগলে গয়নার আর কী মূল্যটা আছে?

কী অবলীলায় যে কথাগুলো বলেছিল সুরভি। চিরকাল মন্দার শুনেছে মেয়েরা নাকি মরে গেলেও গয়না হাতছাড়া করতে চায় না। মন্দারের দিদির বিয়ের সময়ে জামাইবাবুদের বাড়ি থেকে সত্তর হাজার টাকা নগদ চেয়েছিল, খুবই সমস্যায় পড়ে গিয়েছিলেন বাবা। শেষে ধারধোর করে বহু কষ্টে যোগাড় করেছিলেন টাকাটা। মা কিন্তু সেসময়ে নিজের গয়না বেচতে দেননি। দিদিকে যেটুকু দেওয়ার তা দিয়েছেন, বাকিটা সরিয়ে রেখেছিলেন আলাদা করে। মন্দারের বউদি বা সুরভিকেও গুনে গুনে দিয়েছেন গয়না। দাদা মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে মাকে বলে, ওই গয়না নিয়ে তুমি স্বর্গে যেও....। মা শুনে হাসেন, আমি মরলে সবই তো তোদের। যতদিন আছি, ততদিন আমারটা আমার থাক।

মন্দারের মনে হয় মার কাছে গয়নাগুলো বুঝি এক ধরনের নিরাপত্তার প্রতীক। যদি স্বামী না থাকেন, যদি ছেলেরা না দেখে, ওই গয়নাই হয়তো তখন.....। সুরভির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা। নিজের একটা চাকরি আছে বলেই বুঝি অকাতরে সামান্য গয়না কটাকেও বিসর্জন দেওয়ার কথা ভাবতে পারে সুরভি। অথবা নিজের একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই পাওয়ার বাসনাটায় এমন একটা নেশা আছে যার কাছে গয়নাগাঁটি সব তুচ্ছ হয়ে যায়।

এই যে অফিস থেকে ফিরেই কাগজ কলম নিয়ে সুখী গৃহকোণের নক্‌শা আঁকতে বসে যাচ্ছে সুরভি, এটাও তো সেই নেশাই।,

অন্যমনস্ক ভাবে বাথরুম থেকে বেরিয়ে শার্ট-প্যান্ট বদলে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে নিল মন্দার। আনমনেই এসে বসল সোফায়। টিভি চালিয়েছে শব্দ কমিয়ে। সোফা থেকে ক্যাবিনেটের দূরত্ব খুবই কম, চোখে লাগে বলে বড় রঙিন টিভি কিনতে দেয়নি সুরভি, ছোট্ট চোদ্দ ইঞ্চি পর্দাটায় একের পর এক চ্যানেল ঘোরাচ্ছিল মন্দার। রিমোটে। একটা মজার হিন্দি সিরিয়ালে এসে থামল।

সুরভি চা ওমলেট এনেছে। টেবিলে কাপ প্লেটগুলো রেখে বসল পাশে। বলল,—কাল কিন্তু তোমায় একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। অফিসের পর আড্ডা মারতে যেও না।

মন্দার চামচে ওমলেট কাটল,—আমি বুঝি রোজ দেরি করে ফিরি? আজ তো সাতটার মধ্যে ইন্ করে গেলাম।

—কালও এসো। আমি একটু মার কাছে যাব।

—যেও।

—সুবালার মা কাল তাড়াতাড়ি চলে যাবে। তুমি না এলে ঝিমলি কিন্তু একা থাকবে।

—আহা, বললাম তো আসব।

সুরভি একটুক্ষণ চুপ। নিজের চা তুলে চুমুক দিচ্ছে। আলগা ভাবে বলল,—মাকে এবার একটা ভাল স্পেশালিস্ট দেখাতেই হবে।

—সেই হাঁটুর ব্যথার জন্যে?

—হাঁটু নয়। প্রায়ই বলে বুক ধড়ফড় করছে, রাতে নাকি ঘুম আসে না, সারাক্ষণ মাথা জ্বালা করে।

—প্রেশারটা চেক করাচ্ছেন নিয়মিত?

—বলে তো সপ্তাহে একদিন এসে দেখে যায়। কী করে কে জানে! মার নতুন কাজের মেয়েটাও তো ন্যাদোস টাইপ, নড়তে চড়তে পারে না। ওর ভরসায় মাকে ছেড়ে রাখতে যা টেনশান হয়।

—ছাড়িয়ে দাও। অন্য লোক রাখো।

—পেলে তো। একে যোগাড় করতেই আমার যা কালঘাম ছুটেছে। নিজের মতো করে দেখাশুনো করার লোক আজকাল আর পাওয়া যায় কোথায়?

—হুম্। মন্দার মাথা নাড়ল,—তোমার মা'ও কিন্তু যথেষ্ট অবুঝ। কিচ্ছু মানতে চান না।.....সেদিন তো আমি স্বচক্ষে দেখলাম, ভাতের পাতে কাঁচানুন খাচ্ছেন। আমি বোঝাতে গেলাম, আমাকেই তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেন, কাজের লোক ওঁকে আর কী সামলাবে!

—সে কী আর করা যাবে। মা তো চিরদিনই এরকম। যা গোঁ ধরবে, তাই করবে। তার মধ্যে ধমকে-থমকে যতটা নিয়মে রাখা যায়....। কালও তো মাকে আমি ফোনে কত বকলাম।

—তা কোন স্পেশালিস্টকে দেখাবে? কার্ডিওলজিস্ট?

—দেখি। কাল সময় পেলে একবার ওপাড়ার ডক্টর দাসের সঙ্গে কথা বলে আসব। উনিই তো মাকে দেখেন.....যদি উনিই কাউকে সাজেস্ট করে দ্যান।

মন্দার আর কিছু বলল না। চা শেষ করে সিগারেট ধরিয়েছে। হাসির সিরিয়ালটায় থেকে থেকে কোরাসে হাসির শব্দ বেজে উঠছে। অদৃশ্য হাসি। আর পর্দার কুশীলব অবিরাম ভাঁড়ামো করে চলেছে। লঘু মেজাজে সিরিয়ালে মন দিল মন্দার।

সুরভিরও চোখ রঙিন পরদায়। মজা গিলতে গিলতে জিজ্ঞেস করল,—এই, তুমি লইয়ারের কাছে গেছিলে?

মন্দারের ঠিক মাথায় ঢুকল না প্রশ্নটা। পাল্টা জিজ্ঞেস করল,—কোন লইয়ার? কেন?

—বা রে, তুমিই তো বললে ব্যাংক ফ্ল্যাটের সাইট্‌টার সার্চ রিপোর্ট চায়! ব্যাংকেরই নাকি লইয়ারের প্যানেল আছে....!

—এখনই কী? সুব্রত নন্দী আগে পেপার-টেপার দিক।

—দিয়ে দিলেই তো পারে। আমরা তো অ্যাডভান্স করেই দিয়েছি।

—দেবে। দেবে। আগে করপোরেশান থেকে প্ল্যান স্যাংশান করিয়ে আনুক। তারপর তো সার্চ....অ্যাসেসমেন্ট....। ওসবে বেশি সময় লাগে না, আমি খবর নিয়েছি। ভিতপুজোর আগে পেপারস্‌ পেলেই যথেষ্ট, ঝ্যাট ঝ্যাট সব প্যারাফারনেলিয়াগুলো সেরে ফেলব।

—কবে নাগাদ হবে বলো তো ভিতপুজো? আন্দাজ? পুজোর আগে হবে?

—কী করে বলব! পুজোর আগে হলে ভাল, নইলে পুজোর পরেই হবে। তাড়াহুড়ো করার কী আছে?

তাড়া আছে। সুরভি টানটান,—আজ অফিস যাওয়ার সময়ে দেখছিলাম অবিনাশবাবু তোমাদের ওই বিশু দালালের সঙ্গে কথা বলছে।

—তো?

—হঠাৎ বাড়ির দালালের সঙ্গে কথা বলবে কেন? নির্ঘাৎ কোনও মতলব ভাঁজছে। তুমি বড় মুখ করে বলে এসেছ বাড়ি ছাড়ছ, তাই হয়তো ভাড়াটে খোঁজা শুরু করে দিল।

—তুৎ, অন্য কোনও কারণেও কথা বলতে পারে।

—কিন্তু যদি বলে....?

—বলুক। আমরা না ছাড়লে ভাড়াটে বসাবে কোথ্‌থেকে?

—কিচ্ছু বলা যায় না। লোক তো সুবিধের নয়, হয়তো আরও ডিসটার্ব করা শুরু করে দেবে। হয়তো যখন তখন লোক ডেকে এনে ঘর দেখাবে। বলবে, আপনারা তো চলেই যাচ্ছেন......

—ইল্লি রে। মামদোবাজি? অবিনাশ হালদার চাইলেই যাকে তাকে বাড়ি দেখতে দেব? ঘাড় ধরে বার করে দেব।

সুরভি তবু যেন পুরোপুরি আশ্বস্ত হলো না। ঈষৎ উদ্বিগ্ন গলায় বলল,— আমার একটা কথা শুনবে?

—কী কথা?

—সুব্রতবাবুকে বলে দিও, আমরা কিন্তু বাড়ি পুরো কম্‌প্লিট হওয়া অব্দি অপেক্ষা করতে পারব না। ঘরগুলো মোটামুটি তৈরি হয়ে গেলেই পজেশান

নিয়ে নেব। টুকটাক কাজ যা বাকি থাকবে তা নয় পরেই হবে। ধীরেসুস্থে।

এটা তো মন্দারেরও মনের কথা। অবিনাশ হালদারের মতো একটা বিশ্রী আপদকে মাথায় নিয়ে কোন ভদ্রলোক আর বাস করতে চায়! তাছাড়া বাড়িভাড়া আর লোনের টাকা, একসঙ্গে ডবল্ খরচ মন্দার গুনবেই বা কেন!

(ছয়)

বর্ষাকাল এবার বেশ অনেকদিন ধরে চলল। আষাঢ়-শ্রাবণ পার করে সেই প্রায় ভাদ্রমাসের শেষ পর্যন্ত। মেঘেরা যেন ঘরবাড়ি বানিয়ে ফেলেছিল আকাশে। আশ্বিনেও বৃষ্টি হচ্ছিল খুচখাচ। এক-দু'দিন আকাশ দিব্যি পরিষ্কার থাকে, গাঢ় নীলের মাঝে সাবানের ফেনা ভেসে বেড়ায় অলস মনে, তারপর হঠাৎই ফের ঝমঝম ঝমাঝম। একটা ছোটখাটো সাইক্লোনও হানা দিল আশ্বিনে। মাইথন ম্যাসাঞ্জোর পাঞ্চেৎ জলাধারের টইটুম্বুর দশা, ডি-ভি-সি জল প্রায় ছাড়ে ছাড়ে। গোটা রাজ্য জুড়ে বেশ একটা 'বন্যা হয় বন্যা হয়' ভাব।

তা সেরকম কিছু হলো না অবশ্য। মোটামুটি নিরুপদ্রবেই কাটল পুজোটা। হাসি আনন্দে আলোয় প্যান্ডলে, প্রতিমার বাহারে শহর জমজমাট। প্রতি বছরের মতোই জনস্রোতে ভাসল কলকাতা।

ত্রয়োদশীর দিন বউ-বাচ্চা নিয়ে ক্ষীরপাই গেল মন্দার। বিজয়া করতে। তাদের বাড়ি ঠিক ক্ষীরপাইতে নয়, ক্ষীরপাই থেকে মাইল চারেক ভেতরে। গ্রামটার নাম সোনামুড়ি, তবে লোকজনকে দেশের নাম বলার সময়ে ক্ষীরপাই বলাটাই মন্দারের অভ্যেস। প্রতি বছর পুজোর পর মন্দাররা একবার এখানে আসেই। যদি শারদভ্রমণে দূরে কোথাও যায় তো ফেরার পর, নইলে রওনা হওয়ার আগে। এ বছর বেড়ানো বাতিল, টাকা বাঁচানো চলছে, অতএব সোনামুড়িতেই রয়ে গেল সপ্তাহ খানেক। ঝিমলির ছুটির কটা দিন এবার নয় দেশগাঁয়েই কাটল।

সোনামুড়িতে কয়েকটা দিন কাটানোর বাসনাও মূলত ঝিমলির। তার চোখে কুলু মানালি বা কন্যাকুমারিকা কোডাইকানালের সঙ্গে সাংঘাতিক কিছু প্রভেদ নেই সোনামুড়ির। হোক না গ্রাম, বেড়ানোর জায়গা হিসেবে সোনামুড়ি মন্দ কি! একটা সরু নদী আছে, ধানক্ষেত আছে, আমবাগান আছে, ছুটোছুটি করার মতো মাঠ তো আছেই। সবচেয়ে বড় কথা, জ্যাঠার তিন মেয়ের সঙ্গে তার পটে খুব। বিশেষ করে ছোট দুজন তো তাকে রীতিমতো সমীহই করে। ঝিমলির হাঁটা-চলা, কথা বলার কায়দা, চুল কাটার স্টাইল, সবেতেই তারা একটা সিনেমা সিনেমা গন্ধ পায়। ঝিমলি তাদের চোখে মিনি হিরোইন, সর্বক্ষণ ঝিমলির গায়ে লেপটে থাকে দুই বোন। এত খাতির ঝিমলি আর কোথায় পাবে!

সুরভিও এখানে মোটামুটি মানিয়ে নিতে পারে। অন্তত মানিয়ে নেওয়ার

ভানটাতে সে খুব দড়। বড় জায়ের সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরে থাকছে, শ্বশুর-শাশুড়ির সামনে মাথায় আলগা কাপড় তুলছে, ভাসুরের প্রতিও শ্রদ্ধাভক্তি দেখাচ্ছে যথেষ্ট। মন্দারদের বাড়িটা দোতলা, কিন্তু মাটির। এই মাঠকোঠার দালানেও সে একটা ইলাস্টিক হাসি ঝুলিয়ে রেখেছে ঠোঁটে। আগে আগে স্যানিটারি পায়খানা ছিল না বলে সোনামুড়িতে তার একটু অসুবিধে হতো, ইদানীং সে সমস্যাও নেই। তাছাড়া নিজের পছন্দ-অপছন্দর ধ্বজা উড়িয়ে কখনও শ্বশুরবাড়ির লোকদের বিব্রত করতে চায় না সুরভি। সোনামুড়িতে বসবাসের কালটুকুকে সে'ও বেড়ানোর মতো করেই ভেবে নেয়।

যে সোনামুড়িতে একদমই টিকতে পারে না, সে হলো মন্দার। এখানে তার কত অজস্র শৈশবস্মৃতি, পুরোন বন্ধুবান্ধবও কম নেই, তবু এ গ্রাম্য জীবন তার কাছে এখন একেবারেই অসহনীয়। কলেজে পড়ার সময়ে সে গ্রাম ছেড়েছে, পড়ত কলকাতায়, থাকত বিদ্যাসাগর কলেজের হোস্টেলে, শহর এখন তার শিরায়-উপশিরায় ঢুকে গেছে। কখনও কখনও মনে হয় সে সুরভির চেয়েও বেশি শহুরে। এখানে ছোটবেলায় যাদের সঙ্গে ডাংগুলি, ফুটবল খেলত, কিম্বা যারা তার সহপাঠী ছিল, তাদের সঙ্গে দেখা হলে কথা খুঁজে পায় না মন্দার। মনে হয় এরা আর কেউ যেন তার স্তরে নেই। কেউ মুদিখানায় বসছে, কেউ বা ক্ষীরপাই-এ গিয়ে কাজ করছে কাঠের গোলায়, কেউ বা এখন পুরোদস্তুর চাষী। অবশ্য স্কুলমাস্টারি, সরকারি চাকরি করা বন্ধু এখানে আছে মন্দারের। ঘাটাল রাধানগরের কোল্ড স্টোরেজেও কাজ করে কেউ কেউ। কিন্তু তাদের কারুর সঙ্গই যেন আর উপভোগ করতে পারে না মন্দার। কী সব একঘেয়ে আলোচনা। থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়। কোথায় কোন পঞ্চায়েত প্রধান চুরি করে ফাঁক করে দিচ্ছে, কোন গাঁয়ে কোন পার্টি কার ধোপা-নাপিত বন্ধ করে দিল, সামনের লোকসভা নির্বাচনে এবার এ অঞ্চল থেকে কে জিতছে, এই সব। দীর্ঘকাল এখানে বাস না করার জন্য এদের সমস্যাগুলো মন্দার ঠিক মতো অনুধাবন করতে পারে না। বরং গ্রামের তরুণদের তাও একটু চিনতে পারে। শচীন-সৌরভ নিয়ে তাদের তর্কাতর্কি শুনতে পায় চা-দোকানে। তবে এদের সঙ্গেও মন্দারের দূরত্ব অনেক। বেয়াল্লিশ বছর বয়সে শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢোকেই বা কী করে!

দিব্যেন্দু নাকি এখানে মাঝে মাঝে আসে গাড়ি নিয়ে। দিব্যেন্দুরা অবশ্য যথেষ্ট বড়লোক, গ্রামে পাকা দোতালা বাড়ি আছে। তবু মন্দারের ভাবতে অবাক লাগে, দিব্যেন্দু এখানে এসে থাকে কী করে? কলকাতায় যার অত বড় ফ্ল্যাট, কথায় কথায় কলকাতার এ ক্লাব ও ক্লাব ঘুরে বেড়ায়, বাড়িতে তিনখানা বিদেশী কুকুর

পুষেছে, সে এখানে এসে কী সুখ পায়? এও কি দিব্যেন্দুর এক ধরনের বিলাসিতা?

ফ্ল্যাট কেনার কথাটা এখানে এসে বাবা-মাকে জানায়নি মন্দার। দাদা-বউদিকেও না। কেন জানায়নি বলা কঠিন। দেশে সে আর ফিরবে না, সবাই জানে। এই মাঠকোঠার প্রতি তার কোনও আকর্ষণ নেই, এও সকলের জানা। কলকাতায় একটা পাকাপাকি কিছু করে থিতু হওয়াটাই যে তার নিয়তি এটাও নিশ্চয়ই তারা অনুমান করতে পারে। মন্দার বাড়ি থেকে কোনও টাকাপয়সাও চাইবে না। চাইলে দিচ্ছেই বা কে? তবু সে বলতে পারেনি তার পিছনে বোধহয় অন্য একটা কারণ রয়ে গেছে। শহরের মানুষ পুরুষানুক্রমে ভাড়াবাড়িতে কাটায়, একসময়ে সেই মানুষদের কাছে বাড়িটা খাঁচার চেয়েও ভয়ংকর হয়ে ওঠে, এখনকার অণু পরমাণু হয়ে ছিটকে ছিটকে যাওয়া সংসারে একটা একান্ত নিজস্ব আশ্রয়ের জন্য তীব্র আর্তি অনুভব করে তারা। কলকাতার বহু বন্ধুবান্ধবের মধ্যে এই আর্তিটা দেখেছে মন্দার। দেখতে দেখতে এই হাহাকারটা কখন যেন তার নিজের মজ্জাতেও ঢুকে পড়েছে, অজান্তেই। তার এই নাগরিক ছন্দটা বাবা মা দাদার চোখে ধরা পড়ে যাবে, বুঝি এই অস্বস্তিতেই ভুগছে মন্দার। সে এখন আর সোনামুড়ির মানুষ নয়, সে এখন একটা শহরের মানুষের চেয়েও বেশি শহুরে, এই উপলব্ধিটাও যেন তাকে অসহজ করে তুলেছে।

তবু কথাটা গোপন রইল না। ফাঁস করে দিল ঝিমলিই। সচেতন ভাবে নয়, কথায় কথায়।

অবশ্য তাকে গোপন রাখতে কেউ বলেওনি। না মন্দার, না সুরভি। মন্দার ভেবেছিল নিষেধ করলে তো ঝিমলি হাজার প্রশ্ন জুড়বে। কেন বলব না, বললে কী হয়, দাদু কি তোমার ওপর রাগ করবে...! সব প্রশ্নের কি প্রকৃত উত্তর দিতে পারবে মন্দার? আর সুরভি হয়তো চেয়েছে, উপযাচক হয়ে সে কেন বলতে যাবে, বরং মেয়ের মুখ দিয়ে যদি বেরিয়ে যায় সেটাই তো ভাল।

সোনামুড়িতে আসার পর থেকেই মুখে খই ফুটছিল ঝিমলির। আসার পরদিনই বিকেলে দিদিদের সঙ্গে নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিল ঝিমলি, বকম বকম করে শোনাচ্ছিল কলকাতার পুজোর গল্প।

—জানো তো, এবার আমি কতগুলো ঠাকুর দেখেছি? একশো সতেরোটা।

—এ-একশো সতেরো?

—হ্যাঁ গো। আরও বেশি দেখতে পারতাম। নবমীর দিন মা তো ঘুরতে ঘুরতে হাঁপিয়ে গেল।

—কোন ঠাকুরটা তোর সবচেয়ে ভাল লেগেছে রে? কাগজে দেখলাম একটা ভাঁড়ের প্যান্ডেল হয়েছে, ওই ঠাকুরটা?

—ওটাও ভাল। আরও অনেকগুলো ভাল ছিল। ঝিমলি চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শোনাচ্ছিল, আমাদের বাড়ির কাছেই তো একটা প্রতিমা করেছিল। পুঁতি দিয়ে।

—কোন ক্লাবের ঠাকুর? টিভিতে দেখিয়েছিল?

—হ্যাঁ। চন্দনপুকুর। পার্ক আছে, ওইখানটায়। .....জানো, সামনের বছর থেকে খুব মজা হবে। আমরা ফ্ল্যাটের বারান্দায় বসে ওদের পুজো দেখতে পাব।

টুলু-বুলু কথাটা ঠিক বুঝতে পারেনি। প্রশ্ন করেছিল, —সামনের বছর থেকে কেন?

—আমরা তো চন্দনপুকুর পার্কের ধারেই ফ্ল্যাট কিনছি। তিনতলায়। ঐ তিনতলা থেকে ঠাকুর দেখব।

ব্যস্, সংবাদ পৌঁছে গেল যথাস্থানে। রাত্রে খেতে বসে সোমেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন ছোট ছেলেকে,—হ্যাঁ রে মন্টু, তুই নাকি ফ্ল্যাট কিনছিস?

মন্দার সামান্য অপ্রতিভ,—হ্যাঁ...মানে...কত আর ভাড়া গুনি বলো? তাই ভাবলাম একটা কিছু করি...

—ভাল ভাল, খুব ভাল। তা ফ্ল্যাট-ট্যাটে গেলি কেন, জমি কিনে বাড়ি করে ফেলতে পারতিস।

কৈলাশই ভায়ের হয়ে জবাব দিল,—না, না, মন্টু ঠিকই করছে। ওরা দুজনেই চাকরি করে, বাড়ি করার হ্যাঙ্গামা কে পোয়াবে? বলেই ভায়ের দিকে ফিরেছে,—কীরকম সাইজ হচ্ছে তোদের ফ্ল্যাটের?

—খুব বড় নয়। ওই যেমন আজকাল হয় আর কি।

—কত? আটশো-নশো স্কোয়্যার ফিট?

—অত নয়! বেশি বড় কেনার পয়সা কোথায়?

—কত পড়ছে?

—তা পড়ছে। ভালই পড়ছে।

—কত? তিন-চার লাখ?

—হ্যাঁ...মানে...। এবারও মন্দারের ভাসা ভাসা উত্তর, —ওই কাছাকাছি। ব্যাংক থেকে লোন করছি।

কৈলাশ যথেষ্ট বুদ্ধিমান। ভায়ের অস্বাচ্ছন্দ্য সে টের পেয়ে গেছে। আর প্রশ্ন করল না, মন দিয়েছে খাওয়ায়।

মন্দারের একটু খারাপই লাগল। দাদা কি ভাবছে বাবা-মাকে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে লাখ লাখ টাকা জমিয়ে ফেলেছে মন্দার? তাকে কি স্বার্থপর ভাবছে দাদা?

নিজেকে বোঝানোর মতো করে মন্দার বলল,—অনেকদিন ধরে চিন্তাটা মাথায় ঘুরছিল, জানিস। ভাড়াবাড়িতে থাকি, জায়গা নেই, তোরা গেলে কটা দিন থাকতে বলতে পারি না, বাবা-মাকেও নিয়ে গিয়ে রাখতে পারি না বেশিদিন...ওই তো

একখানা ঘর, কোথায় কাকে শুতে দেব, বেশি লোক এসে গেলে বাড়িঅলাও জল-টল নিয়ে ঝামেলা করবে...

সুরভি লুফে নিয়েছে কথাটা। বলে উঠল,—এবার আমাদের দুখানা ঘর। খুব বড় না হলেও একটা হল আছে। আপনারা এবার গিয়ে আরাম করে থাকতে পারবেন।

সুরভির আশ্বাসবাণীগুলো তো সে নিজেই উচ্চারণ করতে যাচ্ছিল। তবু কথাগুলো এমন ফাঁপা ঠেকল কেন? দাদা-বাবার কথা না ভেবে শুধু নিজেদের জন্য ভাবনাটা কি একটু স্বার্থপরতা হয়ে গেছে?

ধুস্, কী ভাবে কী করছে সে তো মন্দারই জানে। ওইটুকু আত্মচিন্তা না করলে তারও যে অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যায়।

নাহ্, এ কথাটা কাউকে বোঝানো যায় না। কোনও কোনও মুহূর্তে নিজেকেও নয়।

(সাত)

নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে একটা ধাক্কা খেল মন্দার। আচমকাই।

সেদিন মন্দার একটু দেরি করে বিছানা ছেড়েছে। আগের দিন অনেক রাত অবধি জেগে ক্রিকেটম্যাচ দেখেছিল টিভিতে, ঘুম ভাঙতে দেরিই হয়েছে একটু। অফিসের দিন, হুটোপুটি করে বাথরুমে ছুটল, বেরিয়েই বাজার যাবে, তখনই সুরভির চিৎকার,— এই এই দ্যাখো, কাগজে কী বেরিয়েছে!

—কী বেরিয়েছে? দাঁত মাজতে মাজতে গলা ওঠাল মন্দার।

—কী একটা মামলা হয়েছে!.....এসো না দ্যাখো না।

ডাকটায় কেমন যেন বিপদের গন্ধ পেল মন্দার। মুখে ব্রাশ নিয়ে হুমড়ি খেল কাগজে। হ্যাঁ সত্যি তো, খবরটা তো বিটকেল। কাগজের তৃতীয় পাতার বাঁ দিকের কলমে ছোট হেডিং-এর নিউজ—করপোরেশানে জমা পড়া প্ল্যানে হাইকোর্টের ইন্‌জাংশান! বিশদ সংবাদ নেই তেমন, শুধু লিখেছে হরেন্দ্রনাথ মুখার্জি নামের এক প্রোমোটার করপোরেশানের বিরুদ্ধে একটি মামলা রুজু করেছিল, তারই প্রার্থনা মতো অন্তবর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি করেছে হাইকোর্ট। ওই আদেশের বলে করপোরেশানে জমা পড়া সমস্ত বাড়ির প্ল্যানই আপাতত আটকা হয়ে থাকবে।

মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে দুজনে।

—কী হলো ব্যাপারটা?

—আমিও তো বুঝতে পারছি না। হঠাৎ চোখে পড়ল। এমন হয় নাকি? যারা কেসের সঙ্গে যুক্ত নয়, তাদের প্ল্যান আটকে থাকবে কেন?

—বটেই তো। ঠিক তো।

—যাও না, এক্ষুণি একবার সুব্রতবাবুর সঙ্গে দেখা করে এসো। ব্যাপারটা বুঝে এসো ভাল করে।

বাজার অফিস ডকে উঠল। পড়িমরি করে ছুটেছে মন্দার।

সুব্রত নন্দীর অফিস তখনও খোলেনি। কাছেই সুব্রতর বাড়ি, ঈষৎ দোনামোনা করে মন্দার সেখানেই গেল।

. সুব্রতর বাড়িটার চেকনাই আছে খুব। দোতালা, ছোট্ট, কিন্তু ভারী দেখনবাহার। কারুকাজ করা থাম, শ্বেতপাথরের সিঁড়ি, শ্বেতপাথরের মেঝে, বাহারী দরজা-জানলা, প্রায় সব ঘরেই এসি মেশিন বসানো। এই বাড়িতেই একটা সুন্দর সাজানো গোছানো ঘরে সুব্রতকে টাকা দিয়ে গিয়েছিল মন্দার। ভুরভুরে গন্ধঅলা কফি খাইয়েছিল সুব্রত, স্বাদটা মন্দারের জিভে লেগে আছে।

গেটের বাইরে মন্দার থমকে দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। ঢেউতোলা গেটে তামার প্লেটে—বিওয়্যার অফ ডগ্স। আগের দিন কেন যেন মন্দারের চোখে পড়েনি লেখাটা। তখন একটা সুখের উত্তেজনায় ছিল বলে কি?

মন্দার বুকের ধুকপুকুনিটা সইয়ে নিচ্ছিল। তখনই চোখে পড়ল আর একজন মধ্যবয়সী এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। মন্দারের চেয়ে কিছুটা বড় হবে, বয়স বছর পঞ্চাশ। বেঁটে, মাথায় টাক, পরনে লুঙ্গি-পাঞ্জাবি। মুখটা চেনা চেনা। বাজারে টাজারে দেখেছে মনে হয়।

গলা ঝেড়ে মন্দার প্রশ্ন করল,—আপনিও কি নন্দীবাবুর কাছে?

—হ্যাঁ। কাগজে একটা খবর দেখলাম....

—প্ল্যানের ব্যাপারে?

লোকটা ঢক করে ঘাড় নাড়ল।

সামান্য স্বস্তি বোধ করল মন্দার। যাক, সে একা নয়। তার মতো উদ্বিগ্ন লোক পৃথিবীতে আরও আছে।

গেটের পরেই ছোট্ট একটু বাগান। গাঁদা ফুটে আছে। চন্দ্রমল্লিকাও ফুটব ফুটব। বাগান পেরিয়ে কলিংবেল টিপতেই অন্দর থেকে গর্জন ঝাপটে এল, ঘাঁউ! ঘাঁউ!

দুজনেই পিছিয়ে এল কয়েক পা। পরক্ষণেই সুব্রত দরজা খুলেছে। সামান্য ফাঁক করে দেখে নিল আগন্তুকদের, তারপর বেরিয়ে এসে টেনে দিয়েছে দরজাটা। পরনে ছাইরঙা নাইটস্যুট, চোখ-মুখ ফোলা ফোলা। সবে বোধহয় ঘুম থেকে উঠেছে।

চোয়াল ছড়িয়ে হাসল সুব্রত,—আরে, কী খবর? সক্কাল সক্কাল আপনারা...?

ভদ্রলোক হাত কচলাল, —একটা নিউজ পড়লাম কাগজে...

—কী বলুন তো?

মন্দার বলল,—করপোরেশানে সব প্ল্যানের ফাইল নাকি.....?

—ও কিছু না। ছোট্ট হাই তুলল সুব্রত,—মিটে যাবে।

সমস্যাটাকে সুব্রত পাত্তা দিল না বলে খুশিই হলো মন্দার। তার মানে সত্যি তেমন কিছু সিরিয়াস ব্যাপার নয়। তবু আরও নিশ্চিন্ত হতে জিজ্ঞেস করল,—কেসটা ঠিক কী নিয়ে হয়েছে বলুন তো?

—বললাম তো কিছু না। ডোন্ট্ ওরি। জানেন তো করপোরেশানের হাল, ব্যাটারা সব সময়ে আমাদের হ্যারাস করার চেষ্টা করে।.......ওই ভদ্রলোক, মানে হরেনদা প্রকাণ্ড একটা প্রোজেক্ট করছে বাইপাস কানেক্টারে। আটখানা বিল্ডিং, কমিউনিটি হল, চিলড্রেনস্ পার্ক..... কোটি টাকার কাজ। করপোরেশান হরেনদার প্ল্যানটাকে নিয়ে নকড়া ছকড়া করছিল, দিয়েছেন হরেনদা মামলা ঠুকে। নে, এবার বোঝ ঠেলা, দ্যাখ্ কার সঙ্গে লাগতে এসেছিস!

ভদ্রলোক পাশ থেকে মিনমিন করে বলল, —কিন্তু আমাদের কাজগুলোও পিছিয়ে গেল তো?

—যাক না। তবু একটা ফয়সালা তো হোক। করপোরেশানের এই অত্যাচারগুলো তো বন্ধ হওয়া দরকার, তাই না?.....হরেনদা কেসটা জিতলে আপনাদেরও অনেক লাভ হবে। এখন করপোরেশানের নিয়মে আমাদের প্রায় অর্ধেকটা জমি ছেড়ে দিতে হচ্ছে, সেই বাদ দেওয়া জমির দামটাও তো আপনাদের ঘাড়েই চেপে যাচ্ছে। আমরা যদি এফ-এ-আর বেশি পাই, আপনাদের ফ্ল্যাটগুলোও বড় হবে, দামও কম পড়বে।

—তাই নাকি? তাহলে তো ভালই হয়। মেঘ কেটে গিয়ে মন্দারের মুখ উজ্জ্বল হয়েছে,—তার মানে আমরাও তাহলে এফেক্টটা পাচ্ছি।

—ফয়সালা ফেভারে এলে নিশ্চয়ই পাবেন। করপোরেশানকে আইন অ্যামেন্ড করতে হবে। সুব্রত বরাভয় দানের ভঙ্গিতে হাসল,—যান যান, নিশ্চিন্তে বাড়িতে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোন। মামলা মিটলেই আপনাদের কাজ স্টার্ট করে দেব।

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করল,—পয়লা বৈশাখের মধ্যে হবে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, না হওয়ার কী আছে! সুব্রতর হাসিতে ধূর্ততা এসেছে এবার। চোখ টিপে বলল,—প্ল্যান আটকে থাকলে তো করপোরেশানেরই লস্। বাবুদের পেটে হাত পড়ে যাবে না?.......আমাদেরও ইন্টারেস্ট আছে। এই তো, আমারই কতগুলো কাজ আটকে গেল। ভেবেছিলাম আপনাদেরটা শেষ করেই লেক গার্ডেন্সের প্রোজেক্টে হাত দেব। ওদিকে গড়িয়াতেও একটা কথা চলছে.....দেরি হলে তো আমাদেরও ব্যবসা চৌপাট।

চিন্তামুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরে এল মন্দার। সব শুনে সুরভির মুখেও হাসি

ফুটেছে,—একদিক দিয়ে ভালই হলো, বলো? আমরাও এর মধ্যে আরও কিছু টাকা জমিয়ে ফেলতে পারব।

সুব্রত বলল,—হ্যাঁ, তুমিও আরও সময় পেলে। এখন আরও কিছুদিন প্রাণ ভরে ফ্ল্যাটের ছবি আঁকো।

(আট)

শীত গিয়ে বসন্ত এল। চলেও গেল। একে একে পেরিয়ে গেল গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ। মন্দার আর সুরভির ফ্ল্যাটের প্ল্যান যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরে। এখনও মামলার কোনও মীমাংসা হলো না।

রোজ সকালে খবরের কাগজ খুলেই প্রথমে আইন-আদালতের পাতা দেখে মন্দার সুরভি। আশ্চর্য, প্রতিদিন কত মামলার রায় বেরোয়, ধর্ষণের, খুনের, ডাকাতির, বধূনির্যাতনের......কিন্তু বাড়ির মামলার রায় কোথ্থাও নেই। এই পৃথিবীর কোন এক কোণে, কোন অকিঞ্চিৎকর সুরভি-মন্দারের একটা স্বপ্ন থমকে গেছে তা নিয়ে কারুরই মাথাব্যথা নেই দুনিয়ায়।

আজকাল প্রায় প্রতি রবিবারেই সুব্রত নন্দীর অফিসে ছোটে মন্দার। এটাও এখন মন্দারের একটা নিত্যকর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। লাভ কিছুই হয় না, শুধু গিয়ে শুকনো মুখে বসে থাকা। সুব্রত নন্দীরও আগের হাসিটা আর নেই, ইদানীং তাকেও বড্ড গম্ভীর দেখায়। মন্দার তাকে বেশি প্রশ্ন করার সাহস পায় না। মন্দারের যদি টাকা আটকে থাকে হাজারে, তো সুব্রতর আছে লাখে। বিপন্ন মানুষকে আরও বিব্রত করা কি মন্দারের মতো ভদ্রলোকের শোভা পায়?

মন্দার অফিসে অনেক আলোচনা করেছে মামলটা নিয়ে। একেক জন একেক মন্তব্য করে, শুনে যায় মন্দার। একদিন বীরেন সরকার বলল, বাড়ি-টাড়ি করতে পারার সঙ্গে ভাগ্যের নাকি একটা যোগযোগ থাকে, প্রোমোটারকে টাকা দেওয়ার আগে মন্দারের তিথি-নক্ষত্র বিচার করে নেওয়া উচিত ছিল। জয়ন্ত ব্যানার্জি একদিন পরামর্শ দিল গোমেদ বা পোখরাজ ধারণ করতে,—ওতে নাকি গৃহসমস্যার চটজলদি সমাধান হয়ে যায়। পাথরচাপা কপাল নাকি পাথরেই খুলবে! সুভাষ মিত্রর মন্তব্য, এ মামলা হলো গিয়ে করপোরেশান আর প্রোমোটারদের দর কষাকষির মামলা, দেনাপাওনার একটা মনোমতো ব্যবস্থা হলেই এ মামলার নাকি আপোসে নিস্পত্তি হয়ে যেতে পারে। তেমন কিছু হলেও হয়ে যাক না, হচ্ছে কই?

মাঝখান থেকে মন্দারদের দিনগুলো একেবারে ফালতু ফালতু চলে গেল। সুরভি ভেবেছিল এই সময়টায় কিছু টাকা জমে যাবে। হা হতোস্মি, একটি পয়সাও জমানো গেল না, উল্টে বেরিয়ে গেল হাত থেকে।

কতদিক থেকে যে খরচ বাড়ে সংসারের। শীতের শেষে দুম করে একদিন বাথরুমে আছাড় খেয়ে পড়লেন সুরভির মা। বেশ খানিকক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলেন, ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল সুরভি। সেরিব্রাল অ্যাটাক? ভাল নার্সিংহোমে ভর্তি করা হলো সুপ্রভাকে, স্ক্যান-ট্যান হলো জলদি জলদি। খারাপ কিছু পাওয়া গেল না বটে, তবে জলের মতো টাকা তো বেরিয়ে গেল।

আরও আছে। হঠাৎ করে শ্রাবণে বিয়ের ঠিক হলো মিলুর। মন্দারের বড় ভাইঝির। ফ্ল্যাট বুক করেছি, টাকা জমাতে হবে, এই অজুহাতে তো হাত উল্টে দেওয়া যায় না। আবার নেই বলারও মুখ নেই। বড় মুখ করে ফ্ল্যাট কিনছি বলে আসার পর হাত উল্টোনো শোভাও পায় না। সঞ্চয়ের ভাঁড়ার শূন্য বললেও লোকে অন্য মানে করতে পারে। অতএব উপায়, প্রভিডেন্ড ফান্ড থেকে লোন। মন্দারের মাইনে থেকে এখন মাসে মাসে ছশো টাকা করে কাটা চলছে। ঝিমলি এইটে ওঠার পর দুটো টিউটর রাখতেই হলো। তারাও প্রতি মাসে নিয়ে যাচ্ছে হাজার মতো। নিজেদের ঘর বানাতে গিয়ে মেয়ের ভবিষ্যতটাকে তো আর অন্ধকার করে দেওয়া যায় না।

সুরভি মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বলে,—আমাদের কপালটাই খারাপ। সাধ আর সাধ্যের ফারাক সামলাতে সামলাতেই জীবনটা কাটল।

মন্দার বলে,—যা বলেছ। ভাবি এক, হয় আর এক। অ্যাদ্দিনে তো নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকে যাওয়ার কথা। তা নয়, এখনও সেই ভাড়াবাড়িতে পচছি।

—অবিনাশগিন্নি তো খুব হাসাহাসি করছে। পাড়ায় বলে বেড়াচ্চে আমরা নাকি ফ্ল্যাট-ট্যাট কিছুই বুক করিনি। সব ভাঁওতা। আমরা নাকি চাল মেরেছি।

—উপায় কী। হাতি যখন পাঁকে পড়েছে, চামচিকের লাথি খেতেই হবে।

—মাঝখান থেকে পঁয়ষট্টি হাজার টাকা লোকটার গব্বায় ঢুকে বসে রইল। কত কষ্টের টাকা।... আমাদের অফিসের রিনাদি তো বলে, দ্যাখ ও বাড়ি হয়তো আর হবেই না। তোরা বরং ও টাকা তুলে দিয়ে অন্য কোথাও চেষ্টা কর।

—বলছ? নেব তুলে?

—থাক। আর ক'দিন দেখি।

তা এই ক'দিন করেই গড়িয়ে যায় সময়। একই ভাবে। ওঠানামা নেই। নিস্তরঙ্গ। একমাত্র যা বেড়ে চলে, তা হলো মন্দার-সুরভির দুশ্চিন্তা। মন্দারের ঘুম পাতলা হয়ে গেছে, সারা রাত ছেঁড়া ছেঁড়া স্বপ্ন দেখে মন্দার। স্বপ্নও নয়, এলোমেলো কিছু ছবি। হতাশার। তার মধ্যেই হঠাৎ হঠাৎ জেগে উঠে টের পায় সুরভিও এপাশ-ওপাশ করছে চার হাত দূরের বিছানায়।

অফিস থেকে ফেরার পথে মন্দার এক একদিন চন্দনপুকুর পার্কের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে জীর্ণ বাড়িটার দিকে, নেশাচ্ছন্নের মতো।

চতুর্দিকে প্রচুর ফ্ল্যাট উঠেছে, রঙচঙে সব বাড়িগুলোর মাঝে ভাঙাচোরা প্রাচীন ওই বাড়িখানা কী বিশ্রী রকমের বেমানান। ন্যুব্জ, ভিখিরির মতো দশা। তবু কখনও কখনও বড় দাম্ভিক মনে হয় বাড়িটাকে।

মন্দারকে দেখে বাড়িটা যেন হেসে ওঠে খলখল। দাঁত বার করা মুখে ভেংচি কাটে,—শখের বলিহারি যাই! ভাঙবি আমায়, অ্যাঁ? দখল নিবি?

রাগে গা পিত্তি জ্বলে যায় মন্দারের। ফস করে সিগারেট ধরায় প্রবীণার মুখের ওপর। চোয়াল শক্ত করে বলে,—নেবই তো। মামলায় জিতে গেলেই নেব। রায় বেরোলেই নেব। ওটা এখন আমার জায়গা।

নিজের কানেই কেমন শূন্যগর্ভ শোনায় কথাগুলো।

(নয়)

অবশেষে রায় বেরোল।

মন্দার নয়, সুরভিও নয়, ঝিমলির চোখে পড়েছে খবরটা।

শীতের সকাল। মন্দার বাজার থেকে ফিরে তাড়াতাড়ি দাড়ি কামিয়ে নিচ্ছিল। লেপ ছেড়ে উঠতে দেরি হয়েছে আজ, পৌনে নটা বেজে গেছে, আধ ঘণ্টার মধ্যে অফিস বেরোতে না পারলে লাল ট্যাড়া পড়ে যাবে। সুরভিরও একই হাল। চুল না ভিজিয়ে কোনোক্রমে গায়ে গরম জল ঢেলে এসে মেয়ের টিফিন গুছিয়ে দিচ্ছিল চটপট।

তখনই ঝিমলির ডাক। বাবা-মার দেখাদেখি তারও আজকাল আইন-আদালতে চোখ বোলানোর অভ্যেস হয়েছে। মন্দার-সুরভির উদ্বেগ বুঝি চারিয়েছে তার মধ্যেও। খবরের কাগজের তৃতীয় পাতায় চোখ রেখে স্কুল ইউনিফর্ম পরা ঝিমলি চেঁচিয়ে উঠল,—বাবা...বাবা... দেখে যাও, তোমাদের সেই কেসটার নিউজ বেরিয়েছে!

একসঙ্গে ঝেঁপে এল স্বামী-স্ত্রী। একবার পড়ে মন্দারের বিশ্বাস হলো না। আবার পড়ল, আবার পড়ল, বার বার পড়ছে। তাই তো! তাই তো! এ খবর কী করে চোখ থেকে এড়িয়ে গেল?

সুরভি কেড়ে নিয়েছে কাগজটা। চোখ কুঁচকে পড়ছে ভাল করে। বলল,—অ্যাই, কী সব লিখেছে গো? বলছে, নিয়মকানুন সব বদলে গেছে?

—দেখছি তো তাই। আবার মনে হয় নতুন করে প্ল্যান জমা দিতে হবে প্রোমোটারদের।

—তার মানে আবার দেরি?

—তুৎ, আর দেরি হবে না। প্ল্যান বানাতে আর ক'দিন। সুব্রত নন্দীর ভাল হোল্ড আছে, ঝটপট পাস করিয়ে আনবে।

—তার মানে আর আগের মতো থাকবে না?

—না থাকলেই বা কী? একটা তো হবে। নতুন ধরনের হবে। হয়তো দেখলে এ প্ল্যানটা আরও বেটার হলো।

ঝিমলি বাবা-মার খুশি লক্ষ্য করছিল। ফিক করে হেসে বলল,—ভালই তো মা। তুমি নতুন করে আরও অনেক ছবি আঁকতে পারবে।

মন্দারও ঠোঁট টিপল,—কাগজ আছে বাড়িতে আর? না এনে দেব?

—ঠাট্টা রাখো। অফিস যাওয়ার পথে একবার সুব্রতবাবুর অফিস ঘুরে যেও।

—এখন কী করে হবে? বিকেলে যাব। ফেরার পথে।

খুশিটাকে সঙ্গে নিয়েই তিনজনে বেরিয়ে পড়ল। হুটোপুটি করে। ঝিমলি এখন অনেক সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তাকে আর স্কুলে পৌঁছে দিতে হয় না, সে নাচতে নাচতে নিজের রাস্তায় চলে গেল। মন্দার-সুরভিও সোজা বাসস্ট্যান্ড।

অফিসে আজ দিনটা ভারী মধুর কাটল মন্দারের। জনে জনে শোনাচ্ছে আজকের সমাচারটা। আলোচনা করছে। দুঃখের খবর তাও নিজের মধ্যে চেপে রাখা যায়, সুসংবাদ একা একা উপভোগ করা বেজায় কঠিন কাজ।

অফিসের কেউ কেউ নজর করেছে খবরটা। বীরেন সরকার তো নিজের চেয়ারে বসার আগেই মন্দারের টেবিল ঘুরে গেল,—যাক, ফাঁড়া তাহলে কাটল!

—হুম্।

—কালীঘাটে আজই একটা পুজো চড়িয়ে দেবেন মশাই।

তথাগত এসে বলে গেল,—এবার কিন্তু তোকে খুব ছুটোছুটি করতে হবে। পারলে কালই ব্যাংকে গিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে আবার কথা বলে আয়।

মন্দার হেসে বলল,—দাঁড়া, আগে কাগজপত্র সব হাতে পাই।

—আরে দূর, বড় গিঁটটা তো খুলে গেছে, তোর আর ভাবনা কী!

—তা ঠিক। তবু প্রমোটারের সঙ্গে আগে গিয়ে একবার কথা তো বলি।

—আজই চলে যা। দেরি করিস না।

দেরি কবতে কি মন্দারও চাইছে? অফিস ছুটির পর কোনও দিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে পড়ল আজ। আগেও বেরোতে পারত, তবে সন্ধে না হলে সুব্রতকে কি অফিসে পাওয়া যাবে? তেমন হলে নয় বাড়িতেই যাবে মন্দার।

শীতের বেলা। বিকেল ফুরোলেই ঝুপ করে আঁধার নেমে আসে। খুচরো-খাচরা জ্যাম পেরিয়ে মন্দার যখন পাড়ায় পৌঁছল, সন্ধে তখন রীতিমতো গাঢ়।

সুব্রত অফিসেই ছিল। একাই। পুরোপুরি একা নয়, সঙ্গে দুই অ্যালসেশিয়ান পাশে রয়েছে। অফিসে এলে বাড়ি থেকে কুকুর দুটোকে নিয়ে আসে সুব্রত।

মন্দারকে দেখেই সুব্রত সহাস্য আপ্যায়ন, —আরে, আসুন আসুন। এত দেরি যে? সব্বাই তো সকালে ঘুরে গেল।

—না...মানে...সকালেই তাড়াহুড়োয় ছিলান...। মন্দার লজ্জা লজ্জা মুখে হাসল।

—এই তো, মুখের রঙ পাল্টেছে। আরে মশাই, আমিও কি চাই আপনাদের দেরি হোক! বলতে বলতে সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিল সুব্রত,—নিন, আজ আমার ব্র্যান্ড খান।

মন্দার সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। তৃপ্ত মুখে বলল,—কাজ শুরু হতে তাহলে আর কত দিন?

—ম্যাক্সিমাম এক দেড় মাস। আজই তো আর্কিটেক্টকে ধরিয়ে দিয়েছি। সুব্রত লম্বা টান দিল সিগারেটে,—তবে এফ-এ-আর তেমন বাড়ল না মশাই। হরেদরে প্রায় একই রইল।

—তাই?

—হ্যাঁ। পেছনের দশ ফুট সেই ছাড়তেই হবে। দু'দিকে চার চার, সামনে ছয়।

—ও।

—দু' একটা মাইনর অ্যাডভান্টেজ দিয়েছে, তবে সে বলার মতো কিছু নয়।

—তার মানে আমাদের ফ্ল্যাট একই সাইজ রইল?

—অল মোস্ট। ওই বড় জোর পাঁচ-দশ স্কোয়ার ফিটের হেরফের হতে পারে। সুব্রত হেলান দিল ঘুরনচেয়ারে,—ওফ্, যা খেঁচাকলটা যে গেল। বিজনেস বসে গেছে, পারমানেন্ট স্টাফদের শুধু মুখ দেখে মাইনে দিতে হচ্ছে...

মন্দার বলল,—আমারও তো মশাই খুব বুরা হাল। বাড়িঅলা তো লাইফ হেল্ করে দিচ্ছে। ভাড়াবাড়িতে মানুষকে এমন মাথা নিচু করে থাকতে হয়।

—বাড়িঅলারাই বা কী করবে বলুন? সুব্রতর স্বরে হঠাৎ বিশ্বজ্ঞানী ভাব,—যা দিনকাল পড়ল। জিনিসপত্রের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এই দেখুন না, দেড় বছরে ইঁট লোহার দাম কোথ্থেকে কোথায় গিয়ে দাঁড়াল। হাজারে প্রায় ছশো টাকা দাম বেড়েছে ইঁটের। সিমেন্ট বস্তা পিছু আঠেরো টাকা।

—হুঁ। মন্দার মাথা দোলাল, —টোম্যাটোর দামই এ বছর দশ টাকার নিচে নামল না।

—তাহলেই বুঝুন। চেপে চেপে অ্যাশট্রেতে সিগারেট নেবাচ্ছে সুব্রত,—একে এই দেড় বছরের লস, তার ওপর ওই ইন্‌ফ্লেশানের প্রেশার...আমিও কি আর আপনাদের আগের দামে ফ্ল্যাট দিতে পারব?

মন্দার কথাটা ঠিক বুঝতে পারল না। ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মুখে বলল,—মানে?

—মানে...সামান্য কিছু এস্‌ক্যালেশান তো করতেই হবে মশাই। হাজারের

নিচে আর পারব বলে মনে হয় না।

—হাজার টাকা স্কোয়্যার ফিট?

—বেশি বলিনি। বিশ্বাস না হয়, খবর নিয়ে দেখুন এখন এ অঞ্চলে কী রেট চলছে। তবে হ্যাঁ, আপনাদের কথা আলাদা। আপনারা অ্যাদ্দিন ধরে আমায় অ্যাডভান্স দিয়ে রেখেছেন, তাছাড়া বউদিকেও আমি কথা দিয়েছিলাম...শুধু বউদির জন্যই নয় আপনাদের রেট পঁচিশ টাকা কম থাকবে।

অর্থাৎ নশো পঁচাত্তর করে! স্কোয়্যার ফিটে একশো পঁচিশ টাকা বাড়বে? তার মানে মোট বাড়বে প্রায় এক লাখ। ব্যাংক থেকে তো কিছুতেই সাড়ে তিনের বেশি পাওয়া যাবে না, বাকি চার লাখ আসবে কোথ্থেকে? না না, তিন লাখ পঁয়ত্রিশ। পঁয়ষট্টি তো দেওয়া আছে। তবু অত টাকা....?

সুব্রত কাগজে-কলমে কী যেন হিসেব করছে দ্রুত। কাগজটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল,—মোটামুটি ভাবে আপনার পড়বে সাত লাখ প্লাস। আপনাদের জন্য আমি আরও কম করব। পুরো সাত লাখই দেবেন।

মন্দারের গলা শুকিয়ে আসছিল। ফ্যাসফেসে গলায় বলল,—এরপর তো রেজিস্ট্রেশান ফি আছে।

—ওটা আর কত পড়বে? আপনার সঙ্গে তো কথাই হয়েছিল সিক্সটি ফরটিতে কাজ করব। সিক্সটি হোয়াইট, ফরটি ব্ল্যাক। তার মানে রেজিস্ট্রেশানে পড়বে আপনার মাত্র তিরিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা। ওই ধরুন, সব মিলিয়ে সাড়ে সাত লাখ।

হ্যাঁ, কথা ওইরকমই খানিকটা হয়েছিল বটে। ছ'লাখ দশ-পনেরো মতন দাম পড়ার কথা ছিল। বলেছিল সাদায় দাম দেখাবে তিন লাখ পঁয়ষট্টি হাজার। রেজিস্ট্রি মিলিয়ে সাড়ে ছয়ের মধ্যে তখন অনায়াসেই কুলিয়ে যেত। ব্যাংক থেকে সাড়ে তিন, বাকি তিন মন্দার-সুরভি ভাগাভাগি করে। পঁয়ষট্টি তো দেওয়াই আছে, বাকি ছিল দুই তিরিশ পঁয়ত্রিশ। সুরভির গয়না বেচে হাজার তিরিশ পঁয়ত্রিশ, সুরভি অফিসে পঞ্চাশ হাজার টাকা অ্যাডভান্সের কথা বলে রেখেছিল, বাকি টাকা কিছু যোগাড় করত, মেজে ফেজে টাকা দেওয়ার সময়ে কিছুটা জমে যেত, দরকার হলে বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে ধার নিয়ে নিত—এভাবেই মোটামুটি হিসেবটাকে ছকে রেখেছিল মন্দার। কিন্তু এ তো কিচ্ছু মিলছে না এখন! ওই টাকাটা জোটাতেই কালঘাম ছুটে যেত, তার ওপর আরও এক লাখ...?

মন্দার প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, —পারব না মশাই।

—কী পারবেন না?

—এত টাকা কোথায় পাব?

—কত শর্ট পড়ছে?

—অনেক। অনেক। অন্তত লাখ খানেক।

—কেন, ব্যাংক লোন নিচ্ছেন না?

—আরে মশাই, সব হিসেব করেই বলছি তো!

—অ। সুব্রত ডানদিকের অ্যালসেশিয়ানটার মাথায় আলগা হাত বুলিয়ে নিল,—তা এক লাখ আর কী এমন? আমার কাছ থেকে নিয়ে নিন। ইন্টারেস্ট বেশি নেব না। এমনিতে আমার রেট মান্থলি আড়াই পারসেন্ট, একেবারে সাহেবদের রেট, ওই ক্রেডিট কার্ড-ফার্ডে যা চলে আর কি। তবে আপনার আর বউদির জন্য আমার কনসেশনাল রেট। টু পারসেন্ট পার মান্থ।

অর্থাৎ মাসে দু'হাজার! সঙ্গে মূল শোধ করাও আছে! তার ওপর ব্যাংক লোন, পি-এফ লোন, এবং সুরভির ধার। মন্দারকে তো উলঙ্গ হয়ে ঘুরতে হবে রাস্তায়। সুরভিকে বেরিয়ে পড়তে হবে বাটি নিয়ে।

মন্দার কাঁপা কাঁপা গলায় বলল,—কিন্তু আপনার সঙ্গে তো এরকম কথা ছিল না সুব্রতবাবু। আপনি বলেছিলেন, আপনি অন্য প্রোমোটারদের মতো নন, এস্কালেশান করবেন না।

—আরে মশাই, কথা তো অনেক কিছুই ছিল না। সুব্রত নির্বিকার,—এই যে আমার প্রাজেক্টটা দেড় বছর পিছিয়ে গেল, ফর নাথিং...

—তার জন্য কে দায়ী? আমরা?

—কেউই দায়ী নন মন্দারবাবু। দায়ী আমাদের কপাল। আমার আপনার...। সুব্রত মুচকি মুচকি হাসছে,—আজই তো সকাল থেকে কতজন এসে ঘুরে গেল। আপনাদের ওই তিনতলার ফ্ল্যাটটার জন্য কী ঝুলোঝুলি, টাকার থলি নিয়ে ঘুরছে হাজার করে দেবে বলে পা বাড়িয়ে আছে। স্রেফ আপনার আর বউদির কথা ভেবেই আমি রাজী হইনি।...আমি তো আমার প্রোপোজাল দিয়ে দিলাম, এবার আপনারা ভাবুন আপনারা কী করবেন।

—দেখি ভাবি।

—দেরি করবেন না। সুব্রতর হাসি চওড়া হলো,—শুভস্য শীঘ্রম। অশুভস্য কালহরণং। হা হা হা। জয় মা বলে নেমে পড়ুন, আমি তো পাশে আছি।

হাসিটা দেখে পিত্তি জ্বলে যাচ্ছিল মন্দারের। ইচ্ছে করছে লোকটার মুখে টেনে একটা ঘুষি চালিয়ে দিতে। কলার চেপে ধরতে লোকটার। আগাম টাকা হজম করে এখন মামদোবাজি।

কিছুই করতে পারল না মন্দার। অবসন্ন পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। নিস্তেজ গলায় বলল, —চলি।

(দশ)

সুরভি পুরোপুরি গুম মেরে গেছে। বাড়িও এখন অস্বাভাবিক রকমের থমথমে। ঝিমলি পর্যন্ত কোনও শব্দ করছে না, বই মুখে খাটে বসে আছে চুপচাপ। দেখেই বোঝা যায়, পড়ছে না ঝিমলি, তার বিষণ্ণ চোখ স্থির হয়ে আছে অক্ষরে। মন্দার সোফায় শরীর ছেড়ে দিয়েছে। হাতের পিঠে ঢেকে রেখেছে চোখ।

নীরবে রাতের রুটি বানাল সুরভি। নীরবে নৈশভোজ সারল তিনজনে। খেতে বসেছে, ঝিমলির একটা ফোন এল। বান্ধবীর। অন্য দিন ফোন এলে ঝিমলি ছাড়তেই চায় না, ধমকে ফোনালাপ বন্ধ করতে হয় মেয়ের। আজ দু'চারটে কথা বলেই রিসিভার নামিয়ে রাখল ঝিমলি। রুটিন করে রোজ রাত্রে একবার সুপ্রভার খবর নেয় সুরভি, আজ যেন ভুলেই গেল। খেয়ে উঠে যন্ত্রের মতো শোওয়ার ঘরে দুটো মশারি টাঙিয়ে দিল, ঝিমলিকে নিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। মা-মেয়ে লেপের তলায় ঢুকে আরও গাঢ় করে দিল নৈঃশব্দ্যকে।

রাত বাড়ছিল। মন্দারের শুতে ইচ্ছে করছিল না। শরীরে অসহ্য ক্লান্তি, কিন্তু ঘুম যেন উবে গেছে চোখ থেকে। শীত করছে খুব, চাদর মুড়ি দিয়ে কুঁকড়ে-মুকড়ে সোফাতেই বসে আছে মন্দার। বসেই আছে।

সুব্রত নন্দীর অফিস থেকে প্রায় টলতে টলতে বাড়ি ফিরেছিল মন্দার। গোটা পৃথিবীটা ধোঁয়া ধোঁয়া লাগছিল। বুকে কী অসহ্য চাপ তখন, মনে হচ্ছিল স্ট্রোক-টোক না হয়ে যায়। সুরভিকে গিয়ে কী করে যে বলবে কথাগুলো।

সব শুনে প্রথমটা রাগে ফেটে পড়েছিল সুরভি, —বদমাইশি। স্রেফ লোকটাব বদমাইশি। এই ক'দিনে একশো পঁচিশ টাকা বেড়ে যাবে স্কোয়্যার ফিটে?

—বলছে তো বেড়েছে।

—বলল, আর তুমি শুনে গেলে? বলতে পারলে না, এতদিন ধরে আমাদের টাকাটা তাহলে আটকে রেখেছে কেন? হাজার বার তো দেখা হয়েছে, তখন কেন বলেনি দাম বাড়িয়ে দেবে?

মন্দার হেরে যাওয়া মুখে বলেছিল,—ওসব কথা তুলে এখন কি আর কোনও লাভ আছে সুরভি? আমরাও তো ফেরত চাইনি টাকাটা। আমরাও তো লোভে লোভে ছিলাম।

—লোভ আবার কী? তার কথা মতো টাকা দিয়েছি। দাম বাড়াবে জানলে আমরা অনেক আগেই টাকা তুলে নিতে পারতাম।

—যা হয়নি, তা হয়নি। আমরাও তো আশায় আশায় ছিলাম, এটা তো ঠিক?

—আমরা কি জানতাম, তোমার ওই সুব্রত পরে এরকম চিটিং করবে?

—এখন তো জানলে, এখনই বা আমরা কী কবতে পারি? ঝগড়া?

মারামারি? সে ক্ষমতাও কি আমাদের আছে? মন্দার অসহায় স্বরে বলেছিল,—বুঝছ না কেন, আমরা পারি না। আমরা কোন প্রতিবাদই করতে পারি না।

সুরভি হিসহিস করে উঠেছিল,—আমি লোকটাকে ছাড়ছি না।

—কী করবে?

—সুদে আসলে সব টাকা আদায় করব। বলব, দেড় বছরের ইন্টারেস্ট আগে গুনে দিন।

—ধরো যদি না দেয়? সুদ কেন আসলটাই যদি না দেয় তুমি কী করবে?

সুরভি পলকের জন্য থমকেছিল। পরমুহূর্তে আরও জোরে বিস্ফোরিত হয়েছে,—বললেই হলো দেবে না? আমাদের কাছে রিসিট আছে। রীতিমতো রেভিনিউ স্ট্যাম্পে সই করা রসিদ।

—তো? যদি না দেয় তুমি কী করতে পারো? মামলা করবে? করো গিয়ে। বছর দশেক কোর্টে ঘুরে মরো। তদ্দিনে দেখবে চন্দন পার্কের পাশের তিনতলাটা বুড়ো হয়ে গেছে।

—তার মানে কোনও প্রতিকার নেই?

—কী আছে বলো? তুমিই বলো?

—আমি চিৎকার করে করে পাড়ায় বলব, সুব্রত একটা ফেরেববাজ, সুব্রত একটা শয়তান। ওর হাসি-হাসি মুখের মুখোশ আমি খুলে দেব।

—তাতে সুব্রতর কাঁচকলা। বেশি উত্যক্ত বোধ করলে কোনও দিন এসে ঘাড় ধরে আমাদের পাড়া থেকে বের করে দেবে। তোমার অবিনাশ হালদারও তখন ক্যানেস্তারা পেটাবে। এবং এও শুনে রাখো, পুলিশও তোমায় রক্ষা করতে আসবে না।

—কেন?

—কেন আবার কী। পুলিশ জনগণের ভৃত্য, আর সুব্রত জনগণের সেবক। সেবক আর ভৃত্য তো ভাই ভাই।... ভুলে যেও না, সুব্রতর পার্টি সোর্সও আছে।

এরপরই সম্পূর্ণ ঝিম মেরে গিয়েছিল সুরভি। যেন হঠাৎই কেউ তার বাক্‌রোধ করে দিল। গলা টিপে ধরল।

সন্ধেবেলার ব্যথাটা আবার ফিরে আসছিল মন্দারের বুকে। এক চরম অসহায়তার অনুভূতি যেন অবশ করে দিচ্ছে তাকে। সুস্থভাবে কিছু ভাবতে পারছে না, ভার হয়ে আছে মাথাটা। টেবিলের ওপর সিগারেটের প্যাকেট পড়ে আছে, হাত বাড়িয়ে তুলতেও ইচ্ছে করছে না। কী কীটের জীবন! উঁহু, কীটও নয়। পোকামাকড়ও তো মনের মতো আশ্রয় খুঁজে নিতে পারে, মন্দারের সেই সামর্থ্যও নেই।

সুব্রতর ওপরেও এই মুহূর্তে আর তত রাগ হচ্ছিল না মন্দারের। সে যেমন একটা বাসস্থানের জন্য মরিয়া, সুব্রত-নন্দীও তেমনই টাকার জন্যে। দুজনের আকাঙ্ক্ষায় দ্বন্দ্ব বাধলে যে বেশি শক্তিশালী সেই তো জিতবে। এটাই তো নিয়ম। সুব্রত ব্যবসা করে খায়, মন্দারদের ওপর দয়া দেখালে তার চলবে কেন? এই একটি ব্যাপার ছাড়া সুব্রত তো এমনি মানুষ হিসেবে খারাপ নয়। সদালাপী, অমায়িক, পাড়াপড়শির অল্পস্বল্প উপকার করে বলেও শুনেছে মন্দার, বছরে দু'বার করে পাড়ায় রক্তদান শিবিরের আয়োজনও করে সুব্রত। শুধু তার সঙ্গে পটল না বলেই সুব্রত মন্দ হয়ে গেল? হয়তো কারুর কারুর কাছে এই সুব্রতই ভাল লোক! এই যুগের বিচারে কর্মবীর!

মন্দার কি একটু বেশি নৈর্ব্যক্তিক হয়ে যাচ্ছে? দার্শনিক? নাকি এমন করে ভাবতে পারলে কষ্টটা একটু কমে?

সুরভি বেডসুইচ টিপে আলো জ্বালিয়েছে ঘরের। বাথরুমে গেল। বেরিয়ে ডাইনিং টেবিলে রাখা জগ থেকে জল খেল একটু। গায়ে শাল নেই, আঁচলটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে বলল, —শোবে না?

সুরভির স্বর শান্ত। শীতল।

মন্দার মৃদু ভাবে বলল, —যাই।

সুরভি ধীর পায়ে কাছে এল। বসেছে পাশে। বলল,—কী ভাবছ?

—আর কী ভাবব? ভেবে তো কূল পাওয়া যাবে না।

—কী করবে এখন? এ বাড়িতেই থাকবে?

—না। আর একটা বাড়ি দেখে উঠে যাব।

—তারপর?

—সেখান থেকে দিন ফুরোলে আবার একটা বাড়ি।

—তারপর?

—আবার আর একটা। এভাবেই ঘুরে ঘুরে কেটে যাক না।

—কাল থেকে তাহলে বাড়ি দ্যাখো। সুরভির স্বর যেন সামান্য দুলে গেল,— এবার কিন্তু আমার দুটো ক্লিয়ার বেডরুম চাই। এই অঞ্চলেই। অন্তত যদ্দিন না ঝিমলির স্কুলটা শেষ হচ্ছে।

—ভাড়া কত পড়বে জানো?

—কত? আড়াই হাজার? তিন হাজার? সাড়ে তিন? আজ থেকে আর একটা পয়সাও জমাব না। সর্বস্ব ভাড়ায় ঢেলে দেব।

মন্দার চমকে তাকাল। দেখছিল সুরভিকে। সুরভির দু'গালে শুকনো জলের রেখা।

মন্দারের কান্না পাচ্ছিল।

(এগারো)

লোডশেডিং চলছে। বাস থেকে নেমে প্রথমটায় অন্যমনস্কভাবে পুরোন রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছিল মন্দার, সম্বিৎ ফিরতেই ঘুরে ফের বড় রাস্তায় এল। কালই তারা বাড়ি বদলেছে, এখনও নতুন বাড়ির পথ সড়গড় হয়নি।

এবারকার বাড়িটা একটু পিছন দিকে। বাসস্ট্যান্ড থেকে মিনিট তিনেক বেশি হাঁটতে হবে। হোক, ক'দিন পরেই অভ্যেস হয়ে যাবে।

ছায়া ছায়া নাগরিক অন্ধকার পেরিয়ে মন্দার পৌঁছে গেল নতুন ঠিকানায়। সুরভি আজও অফিস যায়নি, মা আর মেয়ে মিলে আজ সারাদিন ধরে গোছগাছ করবে সব।

এবার বাড়িটা বেশ ভালই পাওয়া গেছে। সুরভির তো খুবই পছন্দ। ঢুকেই একটা বড়সড় সাইজের হলঘর। ড্রয়িং-কাম-ডাইনিং স্পেস। বাঁ পাশে দুখানা বিশাল বিশাল মাপের শোওয়ার ঘর। একটা পনেরো বাই তেরো, একটা পনেরো দশ। হলের ডানদিক ধরে আধুনিক কেতার রান্নাঘর, বাথরুম, ছোট স্টোররুমও আছে পাশে। কাপড় মেলার অসুবিধে নেই, পিছনে ফালি মতন উঠোনও আছে। নিজস্ব। সবচেয়ে বড় কথা জলের জন্য আলাদা ট্যাংক, ইচ্ছে মতো নিজেরাই পাম্প চালিয়ে নিতে পারবে। একশো বার চালালেও অশান্তির আশংকা নেই, মন্দারদের পাম্পের মিটারও আলাদা। বাড়িওয়ালা চেয়েছিল চার হাজার, সুরভি বলে কয়ে সাড়ে তিনে রাজি করিয়েছে। অ্যাডভান্সটাই কমানো যায়নি, ওটি পুরো চল্লিশ হাজার।

টাকাটা দিতে অবশ্য মন্দার-সুরভির খুব অসুবিধে হয়নি। সুব্রত নন্দী এক কথায় পঞ্চাশ হাজার ফেরত দিয়ে দিয়েছে, বাকিটা বলেছে এক মাস পরে দেবে। তা দিক, মন্দারদের এখন আর কিসের তাড়া! সুদ না জুটুক, আসল এত সহজে মিলে গেল, এই না কত!

বাড়ির কাছাকাছি এসে মন্দার দেখল, সুরভি আর ঝিমলি দরজা-জানলায় পরদা টাঙিয়ে ফেলেছে। পুরোন বাড়ির গেরুয়া বরন পরদা এখন দুলছে নতুন বাড়ির গায়ে।

মন্দার দরজায় টোকা দিল। প্রথমে একটু আস্তে। তারপর জোরে জোরে।

সুরভি দরজা খুলেছে। হাতে মিনি সাইজের লণ্ঠন। মুখ-চোখ বেশ খুশি খুশি। ঝলমল করছে।

স্মিত মুখে ঢুকল মন্দার। লঘু গলায় বলল, —গোছগাছ সব কমপ্লিট?

—না তো কি তোমার মতো অকম্মার ঢেঁকির জন্য কাজ ফেলে রাখব? আর আমি ছুটি নষ্ট করছি না।

—ঝিমলি কোথায়?

—এই তো পুরোন পাড়ার দিকে গেল একটু। কোন বন্ধুর সঙ্গে নাকি দেখা করবে।

—দোতলা তিনতলার সঙ্গে আলাপ হলো?

—দোতলার ভদ্রমহিলা এসেছিলেন।...জানো তো, ওঁরা প্রায় ছ' বছর আছেন। ওঁদের ভাড়াটা আমাদের থেকে কম। আড়াই হাজার।

—আগে এসেছে বলেই কম। এটা ছেড়ে অন্য কোথাও গেলে আমাদের চেয়েও বেশি দিতে হবে।

—তিনতলাতেও শুনলাম বেশ কম ভাড়া।

—বাহ্, সব খবর নেওয়া হয়ে গেছে!

সুরভি হেসে বলল, —এরকম তো আগে কখনও থাকিনি। মাথার ওপর বাড়িওলা নেই, দোতলা তিনতলা সবই ভাড়াটে.....

—অত নিশ্চিন্ত থেকো না। মন্দার একটা টুসকি দিল সুরভির গালে,—তোমার এবারকার বাড়িওলাটি অনেক বেশি শাহেন্‌শা মাল, ভবানীপুর থেকে স্যাটেলাইটে নজর রাখবে।

বলেই মন্দার টুক করে ঢুকে গেছে বাথরুমে। জামাকাপড় বদলাল। বেসিনে জল আছে, শাওয়ারেও। স্নান করার প্রশ্নই নেই, এখনও যথেষ্ট শীত আছে। তবে একটুক্ষণ বেসিনের কলটা চালিয়ে রাখল মন্দার। এও যেন এক ধবনের পরিতৃপ্তি।

বেরিয়ে একটা পাতলা চাদর গায়ে জড়িয়ে নিল। সুরভি ডাইনিং টেবিলে চায়ের কাপ প্লেট এনে রেখেছে। বাহারী টিপটটা বের করেছে শো-কেস থেকে, তাতে চা ঢেলে কায়দা করে অপেক্ষা করছে মন্দারের জন্য।

মন্দার চেয়ার টেনে বসল। জিজ্ঞেস করল, --হঠাৎ এটা বেরোল যে?

—ইচ্ছে। ফালতু জমিয়ে রাখবই বা কেন!

—সুবালার মাকে মাজতে দিও না, দু'দিনেই তাহলে অক্কা পাবে।

সুরভি ঠোঁট টিপে হাসল। একটু চুপ থেকে বলল,—জানো, আজ আবার একজন এসেছিল।

—কে?

—বলো তো কে?

—তোমার মাসতুতো ভাই?

—উঁহু।

—তোমার সেই দাঁতউঁচু বন্ধুটা?

—আজ্ঞে না স্যার। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। তোমার অবিনাশ হালদার আর অবিনাশগিন্নি।

—যাহ্।

—হ্যাঁ গো, এই তো বিকেলবেলা হঠাৎ হাজির। আমি তো দরজা খুলে হাঁ।

—কী করতে এসেছিল? দেখতে?

—আর কি। অবিনাশগিন্নির যা বেড়ালের মতো কৌতূহল। ঘুরে ঘুরে খুঁত খুঁজছিল বাড়িটার। পায়নি। সুরভি চায়ে চুমুক দিল। চোখ ঘুরিয়ে বলল,—আর একটা জব্বর খবর দিল অবিনাশবাবু।

—কী?

—বলছিল, আমরা নাকি ফ্ল্যাটের টাকাটা তুলে নিয়ে ভালই করেছি। সুব্রত নন্দী নাকি ওই পুরোন বাড়িটা এখন ভাঙতে পারছে না। আগের এগ্রিমেন্ট নাকি মানছে না বুড়ি আর বুড়ির ভাইঝি। তারা সুব্রতর কাছ থেকে আরও বেশি টাকা চায়।

—তাই নাকি? অবিনাশ হালদার জানল কোথ্থেকে?

—পাড়ায় শুনেছে বোধহয়।

মন্দার বিজ্ঞের মতো হাসল,—একেই বলে ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

—যা বলেছ। আমাদের সুদটা বুড়িই উশুল করুক। হি হি।

মন্দারও হাসছে। হাসছে সুরভিও। একে অন্যের হাসিটুকু মেখে নিচ্ছে মুখে।

হঠাৎ সুরভি বলল,—জানো, আজ জঞ্জাল পরিষ্কার করতে গিয়ে আমার একগাদা কাগজ বেরোল।

—তোমার কাগজ? কী কাগজ?

—হাবিজাবি। ওই সব আমি যা আঁকতাম আর কি।

—ও। তোমার সেই ফ্ল্যাটের নক্‌শা!

—উঁহু। বলো পাগলামি। কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলেছি। সুরভি একটুক্ষণ নীরব থেকে বলল,—যাই বলো, এই বাড়িটা কিন্তু ওই ফ্ল্যাটের থেকে অনেক ভাল হয়েছে। কত বেশি ফ্লোর-এরিয়া, বড় বড় ঘর, কতটা ওপেন স্পেস.... ওই ফ্ল্যাট কিনলেও আমাদের ওখানে ধরত না।

লণ্ঠন রাখা আছে জানলায়। মৃদু আলোতেও মন্দার স্পষ্ট দেখতে পেল সুরভির চোখ চিকচিক করছে। কেন করছে? মন্দার ঠিক বুঝতে পারল না। মানুষের চোখ কখন চিকচিক করে? আশায়? না হতাশায়? দুঃখে? না সুখে?

মন্দারের বলতে ইচ্ছে করল, আমাদের কি আদৌ কোথাও ধরে সুরভি?

মন্দারের গলায় স্বর ফুটল না। আধো আঁধারে নতুন রঙ করা দেওয়ালের গায়ে নিজের ছায়া দেখছিল মন্দার। সুরভিরও।

কাঁপছিল ছায়া দুটো। কাঁপছে।

৩০ শে এপ্রিল রাত আটটা

দ্বিতীয় টিউশনিটা সেরে বেরনোর মুখে কালবৈশাখী এল। প্রথমে এক ঝলক হাওয়ার ঝাপটা। তারপর আরেক ঝলক। তারপরই দুরন্ত ঝড়ের ধাক্কায় একেবারে তোলপাড় চতুর্দিক। দরজা জানলা সব আর্তনাদ করে উঠল একসঙ্গে। দেওয়াল থেকে ক্যালেন্ডার খুলে পড়ল। টিঙ্কুর বইখাতা নেচে উঠল ফড়ফড় করে। মুহূর্তে ঘর ধুলোয় ধুলোময়। মীরাবৌদি আসার আগে সুতপা দৌড়ে বন্ধ করতে গেল জানলাগুলোকে। বন্ধ কি করা যায়। একটা পাল্লা টানে তো অন্যটা ছিটকে যায়। ঝড়ের আচমকা হানায় দশদিক দিশাহারা। লাল আকাশ চিরে বিদ্যুৎ হেসে উঠল খিলখিল করে। গুড়গুড় মেঘ ডেকে উঠল। সামনের নিমগাছটা মাথা ঝাঁকাচ্ছে পাগলীর মতো। এপাশ থেকে ওপাশে যাচ্ছে, ওপাশ থেকে এপাশ। গলির দিকের জানলাটা বন্ধ করতে গিয়েও সুতপা দাঁড়িয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড। ঝড়ো বাতাসের স্পর্শে গা শিরশির। ঝড় ব্যাপারটা এত সুন্দর তবু কেন যে এত ভয়ংকর। কড়কড় শব্দে বাজ পড়ল কোথাও। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের বাড়ি থেকে শাঁখ বেজে উঠেছে। পাশের বাড়ির নারকেল গাছ দুটো জিমন্যাসটিক দেখিয়ে চলেছে অবিরাম। ঝড়ের পিঠে বৃষ্টিও শুরু হয়েছে বড় বড় ফোঁটায়। সোঁদা গন্ধ উঠছে মাটির বুক থেকে।

টিঙ্কু হাততালি দিয়ে নেচে উঠল, --আয় বিষ্টি ঝেঁপে...

মীরাবৌদি ঘরে এল। সব দিক সামলে সুমলে এসেছে মনে হয়। নিশ্চিন্ত স্বরে বলল, —ব্যস, তুমি আটকে গেলে তো।

—তা গেলাম। কতদিন পর বৃষ্টি এল বলুন তো!

—সত্যি। যা গরম যাচ্ছিল কদিন ধরে। ভালই হল। বোসো। বসে পড়ো। বৃষ্টি না থামলে তো আর...

—তা বলে আমি কিন্তু আর পড়াশুনা করব না। টিঙ্কু তাড়াতাড়ি গিয়ে বইখাতা গোছাতে শুরু করেছে। যত তাড়াতাড়ি তুলে ফেলা যায় আর কি।

সুতপা হেসে ফেলল, —এখন পড়তে হবে না। তবে অঙ্কগুলো করে রেখো। কাল ক্লাস টেস্টে আসতে পারে।

মীরা বৌদি ঠোঁট ওল্টালো, —তাহলেই হয়েছে। তুমি যতক্ষণ পড়াও

ততক্ষণই যা পড়ে টড়ে। তারপর যেই বামুন গেল ঘর...

কথা শেষ হওয়ার আগেই ঝনঝন শব্দে কানে তালা লাগার জোগাড়। বাজ নয়, কারুর বাড়ির টিনের চাল বোধহয় এসে পড়ল পাশের গলিতে। শব্দটা থেমে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ রেশ রেখে দিল।

মীরাবৌদির চোখ মুখে শঙ্কা এল এতক্ষণে, —তোমার দাদা এসময় রাস্তায় টাস্তায় নেই তো! যা আলাভোলা মানুষ!

সুতপা ঘড়ি দেখল। আটটা দশ। টিঙ্কুর বাবা রাস্তায় আছে কি না কে জানে, তবে বাবুলকে নির্ঘাৎ এই জলঝড়েই রাস্তায় বেরোতে হয়েছে সুতপাকে খুঁজতে। বাবা যা ব্যস্তবাগীশ। মা'র ওপর নিশ্চয়ই চোটপাট শুরু করে দিয়েছে এর মধ্যেই।

—এত টিউশনি করে বেড়ানোর কি আছে? আমি কি খেতে দিতে পারি না?

মা বলছে, —এত ভাবনার কি আছে? বৃষ্টিতে আটকে গেছে। থামলে ঠিক চলে আসবে।

—তুমি মেয়েটাকে আহ্লাদ দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলছ।

—আমি তুলছি? না তুমি?

বাড়ি ফিরে কপালে আজ দুঃখ আছে। সেই সাড়ে তিনটেয় বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। শর্ট হ্যান্ড টাইপিং ক্লাস সেরে পাঁচটার মধ্যে পৌঁছে যায় সন্তুকে পড়াতে। সেখান থেকে মিনিট দশেক হেঁটে এ বাড়ি। ঘণ্টাখানেক ধরে পড়ালেও সাতটা, সাড়ে সাতটার মধ্যে বাড়ি ফিরে যাওয়া যায়। আজ সন্তুদের বাড়িতেই দেরি হয়ে গেল। বুলা বৌদি মানুষটা বড় অদ্ভুত। ছেলে বাড়ি নেই, বাবার সঙ্গে বেড়াতে গেছে, যাক না। সুতপা নয় একদিন না-ই পড়াল। ঠিক কথায় কথায় টানা পঁয়তাল্লিশ মিনিট আটকে রাখল, —এখনই এসে পড়বে। আরেকটু বসো না।

তখনকার রাগটা নতুন করে ফুঁসে উঠল বুকের মধ্যে, ভারী তো পঁচাত্তরটা টাকা মাইনে দেয়। তায় রোজ পড়ানো। একদিন কামাই করলে...। নাহ্। এ মাসটা পড়িয়ে ওই টিউশনিটা ছেড়েই দেবে।

ঝড়ের দাপট কমে এবার জোর বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কতক্ষণে ধরবে কে জানে!

মীরা বৌদি জিজ্ঞাসা করল, —এই সুতপা, চা খাবে আরেকবার? করব? সঙ্গে মশলা দেওয়া পাঁপড়ভাজা?

সুতপা মাথা নাড়ল, —মন্দ হয় না।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই টিউব-লাইটটা দপদপ করে উঠেছে। পাখাটা চলতে চলতে থমকাল একটু। আবার চলল। তারপর ঝুপ করে গোটা বাড়ি ঘোর অন্ধকার। যাওয়ার ভঙ্গি দেখে মনে হয় লোডশেডিং নয়, ওভারহেডের তার ছিঁড়ে পড়ল

কোথাও। কথায় কথায় ছিঁড়ে পড়ছে। আর একবার ছিঁড়ল তো ব্যস। যতক্ষণ না সারায় অন্ধকারে ডুবে থাকো। গরমে মরো। একদিন হতে পারে। দুদিন। তিনদিনও। কেমন কাজ করে সব ভগবান জানে। আজ অবশ্য বড় অজুহাত আছে একটা। কালবৈশাখী।

৩০ শে এপ্রিল রাত নটা

পথ বেশি নয়। মুখার্জি পাড়াটা পেরিয়ে গেলেই চৌধুরিবাগান। রাস্তাও চেনা। মুখস্থ। তবু গা ছমছম করছিল সুতপার। পনেরো মিনিট টানা বৃষ্টিতে সব একেবারে ভিজে সপসপ করছে। রাস্তা ঘাট, গাছপালা। ঘরবাড়ি। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। দু'পাশের বাড়ি ঘরের জানলা খোলেনি এখনও। খুললেও বা আলো কোথায়। সুতপা শাড়ির কুঁচি আরেকটু তুলে নিল ওপরে। সাবধানে কাদা জল পার হল। বাঁ হাতে মীরা বৌদির দেওয়া টর্চটাকে জ্বালিয়ে রেখেছে। অর্ধেক পথ চলে এল প্রায়, এখনও একজন লোক চোখে পড়ল না। সাড়ে আটটার মধ্যে এদিকটা এত নির্জন হয়ে যায় না কোনওদিনই। নিদেনপক্ষে সন্ধের ট্রেনে কলকাতা থেকে চাকরি করে ফেরা মানুষগুলোকে তো দেখা যায়ই। গেল কোথায় সব! মীরা বৌদির কথা শুনলেই ভাল হত। টিঙ্কুর বাবাকে সঙ্গে নিয়ে আসা উচিত ছিল। বাবলুই বা তার খোঁজে আসছে না কেন! আরেক প্রস্থ কাদা পেরোনর সময় একটা কোলা ব্যাঙ চলে গেল পায়ের ওপর দিয়ে। জারুল গাছের পাতা কাঁপিয়ে টুপটুপ কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়ল মাথায়, কপালে। সুতপা সত্যি সত্যি খুব ভয় পেয়ে গেল। জল কাদা মাড়িয়ে বেশ দ্রুত পা চালাল এবার। ছপাত ছপাত কাদা ছিটিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটছে। আটটা পনেরোর ট্রেনটা শেয়ালদা থেকে এতক্ষণে পৌঁছল বোধহয়। তীক্ষ্ণ হুইসিলের ঝংকারে অন্ধকার কেঁপে উঠছে। আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই পেছনে কয়েকটা গলা শুনতে পেল। সুতপা কান খাড়া করল। দেখতে দেখতে দুটো সাইকেল এসে গেছে পেছনে। ঘুরে তাকাল সুতপা। চেনা চেনা লাগছে। ঘোলাটে অন্ধকার পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। পাশে সরে যাওয়ার আগেই একটা সাইকেল গায়ের ওপর এসে পড়ছে,

—আরে তপু! তুই! কোথায় গিয়েছিলি!

কাজলের মুখ দিয়ে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে ভুরভুর করে। সুতপা দুপা পিছিয়ে গেল। কী হয়ে গেছে কাজলদা। ছোটবেলায় কাজলদার সঙ্গে কী ভাবটাই ছিল। কত সরল ছিল তখন। সাধাসিধে। সুতপার বন্ধুর দাদা। সেই সূত্রে সুতপারও। এককালে নস্যিবুড়ির গাছ থেকে কত জামরুল চুরি করে এনে দিত। বুড়িবসন্তী

খেলায় যোগ দিয়েছে তাদের সঙ্গে। খুকু বলত, লজ্জা করে না দাদা, মেয়েদের সঙ্গে এসে খেলিস? শুনে হাসত, খেলা খেলাই। মেয়েদের সঙ্গে, ছেলেদের সঙ্গে কি? সেই ছেলে আচমকাই কেমন পাল্টে গেল। বড় হওয়ার পরই। ইদানীং নাকি খুব পার্টি ফার্টি করে। এ অঞ্চলের এম এল এ-র ডানহাত। দুর্জনে বলে ডানহাত না ছাই। আসলে পোষা গুণ্ডা।

সুতপা আড়ষ্ট হল সামান্য,

—টিউশনি থেকে ফিরছিলাম। বৃষ্টিতে এমন...

—কোথায় টিউশনি করিস?

—ওই তো, সাহেব বাগানের দিকে।

অন্য সাইকেলটা একটু দূরে দাঁড়িয়েছে। সওয়ারি দুজন। কাজল তাদের ডাকল।

—এদিকে আয়। আমাদের পাড়ার মেয়ে। তপু। খুব ভাল মেয়ে। তোর ভাল নাম সুতপা তাই নারে?

সঙ্গী দুজন কাদা মাড়িয়ে সামনে এল।

—আমার বন্ধু। পিঙ্কা, আর এ সুজয়।

সুতপা হাত জোড় করে নমস্কার করার চেষ্টা করল। দুটো হাত মিলল না ভালভাবে। সুজয় ও পিঙ্কার মুখ দিয়েও কটু গন্ধ বেরোচ্ছে। চোখগুলো ঢুলু ঢুলু।

কাজল হাত ধরে টানল, —আয়। বাড়ি যাবি তো?

একবার এদিক ওদিক দেখে নিল সুতপা। ঠিক পেছনে নতুন একতলা বাড়ি উঠেছে একটা। সামনে রাঙচিতার বেড়া। সেই বাড়িটার জানলা থেকে কে যেন উঁকি মেরে দেখছে। আজকাল এদিকে যেখানে সেখানে প্রেম করার বহর খুব বেড়েছে। একটু অন্ধকার, একটু আড়াল আবডাল পেলেই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায় কপোত কপোতী। তাকে ওরকমই কিছু ভাবছে নাকি! তাড়াতাড়ি রাস্তা ধরে হাঁটা শুরু করল সুতপা।

আগে আগে সুতপা হাঁটছে, পেছনে সাইকেল নিয়ে তিন আধা মাতাল। এ রাস্তাটা পার হলেই বড় রাস্তায় পড়বে। বড় রাস্তার ওপরে পুকুর বুজিয়ে নতুন ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরি হচ্ছে একটা। দেখতে দেখতে এমন একটা মফস্বলেও কতগুলো পাঁচতলা ছ'তলা ফ্ল্যাট উঠে গেল। কলকাতা থেকে বেশি দূরে নয় বলে অবাঙালিরাও ইদানীং ভিড় করতে আরম্ভ করেছে। সুতপা আরেকটু গতি বাড়াল চলার। বড় রাস্তা ধরে কিছুটা গেলেই ডানদিকে শনিমন্দির। শনিমন্দিরের গা দিয়ে বাড়ির রাস্তা। হাঁটতে হাঁটতে সুতপা ওদের সঙ্গে দূরত্বটা বুঝে নেবার চেষ্টা

করছিল। বড় রাস্তার কাছে আসতে এক আধজন মানুষ দেখা যাচ্ছে এবার। এক আধজনই। তারপর অন্ধকার রাস্তা নিঝুম আবার। জোরালো হেডলাইট জ্বেলে একটা বাস দৌড়ে গেল স্টেশনের দিকে। স্টেশনের দিক থেকেও বুড়োশিবতলার দিকে গেল একটা বাস। তাদের আলোয় মুহূর্তের জন্য আলোকিত রাস্তাঘাট। আবার যে আঁধার, সে আঁধার। সুতপা হাতের মুঠোয় টর্চটাকে চেপে রাখল শক্ত করে। লোডশেডিংয়েও এক ধরনের আবছা আলো থাকে পথেঘাটে। আজ যেন তাও নেই। আকাশ জুড়ে এখনও লাল মেঘ। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে মাঝে মাঝে, আরেকবার বৃষ্টি নামবে বোধহয়।

সর্বনাশটা ঘটে গেল বড় রাস্তাতেই। অর্ধেক তৈরি ইঁট কাঠ বার করা ফ্ল্যাট বাড়িটার সামনে এসে।

কাজল হঠাৎ গম্ভীর গলায় ডেকেছে পেছন থেকে,

—এই তপু, দাঁড়া।

দাঁড়াবে না ভেবেও দাঁড়িয়ে পড়েছে সুতপা।

—আগে আগে হাঁটছিস কেন? আমাদের সঙ্গে হাঁটা যায় না?

সুতপা কি জবাব দেবে ভেবে পেল না।

কাজল মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। সাইকেল আড়াআড়ি ভাবে রেখে রাস্তা জুড়ে দিয়েছে,

—আমার সঙ্গে হাঁটতে ঘেন্না করে?

কাজলের মুখ চোখ একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে। এ কাজলকে একদম চেনে না সুতপা। উত্তর দিতে গিয়ে গলা কেঁপে গেল। সঠিক উত্তর এল না স্বরে,

—ঘেন্না করবে কেন?

—আমার সঙ্গে কথা বলিস না কেন আজকাল?

—তোমার সঙ্গে দেখা হয় কোথায়?

—এই তো হল। তবু কই... কথার ফাঁকে কাজল সুতপাব আপাদমস্তক দেখছে। বুকের কাছে এসে দৃষ্টি স্থির হল,

—বেশ সুন্দর দেখতে হয়েছিস এখন। ছোটবেলায় একেবারে প্যাংলা ছিলি।

সুতপা আড়ষ্টভাবে আঁচল টানল বুকের। হাসার চেষ্টা কবল। হাসি ঠিক ফুটল না,

—তুমিও অন্যরকম হয়ে গেছ কাজলদা।

—কিরকম?

—বুঝিযে বলতে পারব না। সুতপা কাজলের সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে হাত

রাখল, চলো। মা বাবা ভাবছে...

—না। এখন যাওয়া হবে না। কাজলের গলা নেশায় জড়িয়ে এল, বলতে হবে আমাকে কেন ঘেন্না করিস।

—বললাম তো করি না।

—আলবাৎ করিস।

সুতপার শরীর হিম হয়ে এল। নিজের অজ্ঞাতেই চোখ চলে গেছে কাজলের বন্ধু দুজনের দিকে। অন্ধকারেও চোখ জ্বলছে ছেলেদুটোর।

কাজলও ঘুরে তাদের দেখে নিল।

—ঘেন্না করিস না তো আয় দেখি।

—কোথায়?

—আয় না। তোর সঙ্গে বহুকাল পরে একটু গল্প গুজব করা যাক। ওখানটা গিয়ে বসি চল।

—না, কাজলদা, প্লিজ। সুতপা প্রাণপণ অনুনয় জানানোর চেষ্টা করল, — আজ অনেক রাত্তির হয়ে গেছে। বাবা মা খুব ভাবছে... তুমি বরং আমার সঙ্গে বাড়িতেই চলো না।

—চোপ। কোনও কথা নয়। এবার কাজলের আগে কথা বলছে কাজলের বন্ধু। বোধহয় পিঙ্কা। হিংস্র আওয়াজের ধাক্কায় কালো নির্জনতা বুঝি ফালাফালা হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যজন এসে হাত ধরে টানছে,

—আয় বলছি। ভ্যানতাড়া করিস না। এমন একটা বর্ষার রাত... চমচমে অন্ধকার...

—সামনে শালা এমন জেল্লাদার মাল...

পিঙ্কা সুজয় দুজনেরই চোখ চকচক করে উঠল। ধারালো ছুরির ফলার মত। কাজল হাত রাখল পিঠে—আয়। ঝামেলা বাড়াস না।

বুড়োশিবতলার দিক থেকে দুটো সাইকেল রিক্সাকে আসতে দেখা যাচ্ছে। অতি মন্থর গতিতে। কাজলের হাত ছাড়িয়ে সুতপা দৌড়ে যাওয়ার চেষ্টা করল সেদিকে। তার আগেই মুখ চেপে ধরেছে কাজল। চিতা বাঘের ক্ষিপ্রতায় একটানে নিয়ে চলে গেল আধা তৈরি বাড়িটার সামনে। রিক্সাদুটো কাছে এসেও এল না। বেশ কিছুটা আগে ডানদিকে পরপর বেঁকে গেল। আলোহীন রাস্তায় কেউ আর নেই কাছাকাছি। তবু শেষবারের মত কাউকে একটা ডাকার চেষ্টা করল সুতপা। কেউ শুনতে পেল না সে ডাক। মুহূর্তের মধ্যে তিনজনে মিলে তাকে টেনে হিঁচড়ে ঢুকিয়ে নিল বাড়িটাতে।

৩০ শে এপ্রিল রাত দুটো

...ইটস্ আ কেস অফ গ্যাংরেপিং উইথ সিভিয়ার ইনজুরিজ অন প্রাইভেট পার্টস... দা পেশেন্ট ওয়াজ ব্রট টু এমারজেন্সি অ্যাবাউট টেন থার্টি পি এম ইন আ সেমিকনশাস কন্ডিশন উইথ ডিপ মেন্টাল শক অ্যান্ড ইনজুরিজ অন হার বডি... অন এপ্রিল...

রীতিমত চিৎকার করে মেডিক্যাল রিপোর্ট পড়ছে ডিউটি অফিসার। অত জোরে পড়ার দরকার নেই তবুও। পড়তে পড়তে অন্য টেবিলে বসা মেজ দারোগার দিকে তাকাল,

—আবার একটা কেস ঘোষালদা। দু'মাসের মধ্যে অ্যানাদার কেস অফ মাসরেপিং।

রিপোর্টটা শোনার সময়ই মেজ দারোগা নড়ে চড়ে বসেছিল। এবার টানটান হল।

—কোন জায়গায় হল?

—বলছে তো স্টেশন রোডের ওপরেই।

—লিখে নে।

—লিখব?

—লেখ।

পুরনো আমলের কড়িবরগাঅলা বড় সড় ঘরে গোটাচারেক লণ্ঠন জ্বলছে। জানলাগুলো সব তারজালে ঘেরা। সেই জালের ওপর এলোমেলো আলো পড়ে ভুতুড়ে ছায়া তৈরি হয়েছে কয়েকটা। প্রিয়ব্রত ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে আছেন সেদিকে। ডিউটি অফিসার তাঁর দিকে তাকাল এতক্ষণে,

—আপনার মেয়ে?

শুনেও শুনতে পেলেন না প্রিয়ব্রত। তাঁর হয়ে অনুতোষ উত্তর করলেন,

—হ্যাঁ স্যার। এনারই মেয়ে।

—আর এরা?

—এটি এনার ছেলে। এরা দুজন ওরই বন্ধু। পাড়ারই। ভানু আর নোটন।

ডিউটি অফিসারের জটিল চোখ বাবুলকে ছুঁয়ে অন্য দুজনকে জরিপ করল ভালভাবে। দৃষ্টি দেখে মনে হয় অপরাধীদের দেখা মাত্র চিনে ফেলেছে।

বাবুল চোখ বন্ধ করে ফেলল। দিদির এখনও জ্ঞান ফেরেনি ভালভাবে। হাসপাতালের বেডে যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

ভানু নোটনের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ডিউটি অফিসার বাবলুর দিকে ফিরল,

—তুমিই তাহলে প্রথমে দেখতে পেয়েছ বলছ?

দাঁতে ঠোঁট চেপে বাবলু মাথা নাড়ল।

—কী নাম তোমার?

—বাবলু। সুমন ... সুমন বসু।

—আর কে ছিল তোমার সঙ্গে?

বাবলু নোটনের দিকে তাকাল। নোটন নিজেই বলে উঠেছে,

—আমি। আমি স্যার।

—তোমার কী নাম?

—নোটন হালদার।

—ওখানে তোমরা কী করতে গিয়েছিলে?

অদ্ভুত প্রশ্ন। নোটনের স্বর হোঁচট খেয়ে গেল,

—মানে স্যার....

—বলো। বলে ফ্যালো। ওখানে তোমরা কী করছিলে?

বলার ভঙ্গিতে বিশ্রী ইঙ্গিত যেন। বাবলুর মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। কী বলতে চায় লোকটা? নোটনকে থামিয়ে স্পষ্ট গলায় বাবলু কথা বলল এবার,

—দিদিকে খুঁজতে গিয়েছিলাম।

—কী দেখলে?

চোখের সামনে দৃশ্যটা আবার ভেসে উঠল নতুন করে। সে দৃশ্যের বর্ণনা কোনওদিন আর কাউকেই দিতে পারবে না বাবলু। দৃশ্য নয়, দুঃস্বপ্ন। সারাজীবনের মত গেঁথে গেছে বাবলুর বুকে।

বৃষ্টি থামার পর দিদিকে খুঁজতে বেরিয়েছিল। একটু বিরক্ত হয়েই। মা বাবা আজকাল অল্পেতেই এত বেশি চিন্তা শুরু করে।

গলির মুখে দেখা হয়ে গেল নোটনের সঙ্গে,

—কি রে কোথায় চললি?

—আর বলিস না। দিদিটা এখনও ফেরেনি। জলঝড়ে কোথাও আটকে গেছে বোধহয়। এদিকে বাবা জোর টেনশন শুরু করে দিয়েছে। মহারানিকে এখন এসকর্ট করে নিয়ে আসতে হবে।

—তোরই বা একটু এগিয়ে দেখতে অসুবিধে কোথায়?

—যাচ্ছি তো।

—চল। আমিও যাই।

নোটন সঙ্গী হল বাবলুর। দুজনে বড় রাস্তায় উঠল। আলো না থাকলে অত

বড় রাস্তাটাও কেমন ভূতের মত হয়ে যায়। শনিমন্দিরের পাশে, হরিপদদার দোকানে টিমটিম টেমি জ্বলছে। উল্টোদিকে কাপড়ের দোকান বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। সাইকেল সারানোর দোকানটাও। একটু হেঁটে পানদোকান থেকে দুটো সিগারেট কিনল নোটন। নতুন সিগারেট খাওয়া ধরেছে, মাধ্যমিক পরীক্ষার পর। নিজেরটা ধরিয়ে দড়িটা বাবলুর দিকে বাড়াল,

—নে। ধরা।

পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়েই টান দিতে লাগল দুজনে। এদিক ওদিক চোখ। চেনা লোক দেখলেই লুকিয়ে ফেলবে। শুক্লাদি আর শুক্লাদির বর ফিরল কোথ্থেকে। অর্ধেক খেয়ে সিগারেট নিভিয়ে দিল বাবলু। রেখে দে। ভাল্লাগছে না আর।

নোটন চোখ টিপল,—ভাল্লাগছে না? না ভয়? তপুদি এসে পড়বে।

—ধুস। ওকে কিসের ভয়। আই ডোন্ট কেয়ার। চল। একটু চা খাওয়া যাক।

—তপুদিকে খুঁজতে যাবি না?

—খোঁজার কী আছে? কচি খুকি নাকি? ঠিক টাইমলি এসে যাবে।

এভাবেই চা সিগারেটে সময় গেল বেশ খানিকক্ষণ। তখনও বাবলু ভাবতে পারেনি কত বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেছে ওই বড় রাস্তার ওপরেই। না। মেজদার দোকান থেকে বেরোনর পরেও না। তখনও ভাবছিল চৌধুরিবাগান দিয়ে যদি শর্ট কার্ট করে দিদি, তবে লাগবে পনেরো মিনিট। বড় রাস্তা দিয়ে এলে সময় বেশি লাগে। জল কাদার মধ্যে কি আর চৌধুরিবাগান দিয়ে আসবে? দিদি যথেষ্ট চালাক চতুর। ওরকম বোকামি করবে না।

সেজদার দোকান থেকে বেরিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত মনেই হাঁটছিল ওরা।

—হ্যাঁরে, এর মধ্যে পাস করে যায় নি তো?

—নাহ। আমি নজর রেখেছিলাম।

নতুন ফ্ল্যাট বাড়িটা যেখানে তৈরি হচ্ছে তার আশপাশ বেশ ফাঁকা। সামনে অনেকটা মাঠ পড়ে আছে। দিব্যেন্দু সরকারের বাড়ির পাশে জমি কিনেছে দিদিদের কলেজের এক প্রফেসর। তার পাশে ভিত অবধি তুলে ফেলে রেখেছে বাজারের নটে মুখুজ্যে। তার পরেই দাঁত বার করা ফ্ল্যাটবাড়ির খাঁচা। ঠিক যেখানটায় বাড়িটা উঠেছে তার সামনে ঢালমতন আছে অল্প। ওখানে কেউ শুয়ে বসে থাকলে সহজে চোখে পড়ে না। বাবলুদেরও পড়েনি। বাড়িটা পেরিয়ে যাওয়ার পর মনে হল কেউ যেন হামাগুড়ি দিয়ে রাস্তায় উঠতে চাইছে। কে ওখানে! কী হয়েছে! কী করছে অত রাতে! সামনে এগিয়ে দেখতে গিয়ে বাবলু পাথর।

দিদি!

নোটন দৌড়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। সুতপার শরীরে শাড়ির চিহ্নমাত্র নেই। ব্লাউজ ছেঁড়া। নোংরা কাদায় চোখ মুখ এমন মাখামাখি যে অন্য কেউ দেখলে চিনতে পারত না।

—অ্যাই দিদি? কী হয়েছে তোর? অ্যাই দিদি?

সুতপা বার কয়েক চোখ খুলে তাকানোর চেষ্টা করল। হাত বাড়িয়ে বলতেও চাইল কিছু। কিছুই বোঝা গেল না। গলা দিয়ে উদ্ভট গোঁ গোঁ শব্দ বার হল মাত্র। ঠোঁট, গাল, কপাল, চিবুক সব একসঙ্গে কেঁপে উঠল থরথর করে। জল থেকে তোলা মাছের মতো কাদায় আছাড় খেল দু-তিন বার। তারপর বাবলুর হাতের ওপরই অজ্ঞান হয়ে গেল।

বাবলু দুহাতে মুখ ঢেকে ফেলল।

ডিউটি অফিসার খাতায় খসখস করে কিছু লিখে চলেছে। শেষ করে আবার প্রশ্ন করল,

—কী দেখলে বলো?

বাবলু ঢোক গিলল। বলতে গিয়ে স্বর দুলে গেল ভীষণভাবে,

দিদি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

—বাড়িটার ভেতরে? না বাইরে?

—বাইরে।

আবার কিছু লিখল ভদ্রলোক। মেডিকেল রিপোর্টে নতুন করে চোখ বোলাল,

—তোমার দিদিকে কি প্রায়ই খুঁজতে বেরোতে হয়?

—না। আজ বৃষ্টির জন্য দিদিব দেরি হচ্ছিল।

—রোজই তোমার দিদি সন্ধ্যের পর বাইরে থাকে? এরকম?

—দিদি পড়াতে যায়।

—আজ পড়াতে গিয়েছিল কিনা তুমি সিওর?

বাবলুর গলা শক্ত হল এবার, হ্যাঁ। আমার দিদি রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোর মেয়ে নয়।

ডিউটি অফিসারের ঠোঁটে এক ফালি বাঁকা হাসি দেখা দিল। বাবলুর দু'হাত নিজের অজান্তে মুঠো হয়ে গেছে। লোকটা অকারণে উল্টোপাল্টা জেরা করে চলেছে। কঠিন একটা উত্তর এসে গিয়েছিল মুখে, অনুতোষ কাকা তার আগেই উত্তেজিত ভাবে বলে উঠেছেন,

—শী হ্যাজ বিন রেপড্ স্যার। ক্রুটালি।

—জানি। আপনাদের সকলকে আলাদা আলাদা স্টেটমেন্ট দিতে হবে।

দুহাতে মুখ ঢেকে বসে আছেন প্রিয়ব্রত। এখনও মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছেন।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত মানুষটা। কটা বাজে এখন?

অনুতোষ ঘড়ি দেখলেন। মাথার সামনে বড় দেওয়ালে ঘড়িতে দুটো দশ। হাসপাতাল থেকে এখানে এসে পৌঁছেছেন প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট। এত রাতেও কোথথেকে দুটো বছর পঁচিশের ছেলেকে ধরে নিয়ে এল মেজ দারোগা। গম্ভীর মেজাজে কনেস্টবলদের হুকুম দিল, পুরে রাখ ভেতরে। শালা। পাতা খাওয়া পার্টি সব। সকালে বাড়ির লোক এলে আমায় ডাকবি। আমি না আসা পর্যন্ত....

লোক দুটোর চেহারা সিড়িঙ্গে টাইপের। চোখ গর্তে ঢোকা। জুলজুল করে তাকাচ্ছিল চারদিকে। দৃষ্টিতে কোনও ভাষা নেই। প্যান্ট শার্ট মোটামুটি চকচকে। দামি। কারা এরা? কোথথেকে এল। এরা কি তাঁরই ছাত্র ছিল কোনওদিন? ইদানীং এসবের বহর খুব বেড়েছে এদিকে। বছর দশেক আগে বড় বড় দুটো কারখানা বসার পর থেকেই হু হু করে অবস্থার পরিবর্তন হয়ে চলেছে। নুতন নতুন বসতি গড়ে উঠছে। নতুন মুখ। বাজারে গেলে অনেককে চিনতে পারেন না অনুতোষ। সময় কী দ্রুত এগিয়ে যায়। গুন্ডা মস্তানদের সংখ্যাও বাড়ছে দিনে দিনে। ছিনতাই পার্টি। ওয়াগন ব্রেকার। গত বছর ইলেকশনের আগে চার পাঁচটা খুনই হয়ে গেল। রাজনীতির জমি দখল। কত ভদ্র ছেলে আস্তে আস্তে কোথায় নেমে গেছে। এই তো বিপিনবাবুর ছেলেটা...। অনুতোষের মাথায় চকিতে বিদ্যুৎ খেলে গেল। দু হাত্তা রোজগার করছে আজকাল। বাড়ির হাল ফিরে গেছে। গায়ে রঙ চড়েছে। পাশ দিয়ে গেলে সারা দিনরাত হিন্দি ফিল্মের শব্দ শোনা যায়। উদ্দাম। ছেলেটার এখন মস্তান হিসেবে রামনগরে খুব নাম ডাক। গোটা অঞ্চলের লোক মান্যিগণ্যি করে। ভয়ে। আতঙ্কে। ক্ষমতাব দাপট দেখে। বিপিনবাবুও আর সে বিপিনবাবু নেই। যে লোকটা এককালে বিপ্লবী ছিলেন। সরকারের দেওয়া তাম্রপত্র ফিরিয়ে দিতে যাঁর হাত কাঁপেনি, সেই লোকটা কেমন কুঁজো হয়ে গেছেন। লাঠি ছাড়া হাঁটতে পারেন না। দেখা হলে কথাবার্তা বিশেষ বলতে চান না। এড়িয়ে যান। প্রিয়ব্রতর মেয়েটাকে বিপিনবাবুর ছেলে কাজলই কি...।

অনুতোষের মাথা গুলিয়ে যেতে শুরু করল। ডিউটি অফিসার আবার এক মনে কী লিখে যাচ্ছে। মেজ দারোগা ইউনিফর্ম ছেড়ে লুঙ্গি পরে এসে বসেছে নিজের চেয়ারে। গেঞ্জির ভেতর দিয়ে রুল চালিয়ে পিঠ চুলকোচ্ছে। ঘসে ঘসে। দরজার ঠিক গোড়ায় সেন্ট্রিটা ঝিমোচ্ছে টুলে বসে। থানাতেও রাত নেমেছে। কালবৈশাখী বয়ে যাওয়ার পরে ঠাণ্ডা রাত। ইলেকট্রিকের তার ছিঁড়ে যাওয়া অন্ধকার রাত।

লেখা শেষ করে ডিউটি অফিসার প্রিয়ব্রতর দিকে তাকাল। গলার স্বর আচমকা নরম করে ফেলেছে। প্রিয়ব্রতকে দেখে এতক্ষণ পর বুঝি মায়া এসেছে

মনে।

—এবারে যে স্যার আপনাকে একটু...

প্রিয়ব্রত যেন অনেক কষ্টে ঘাড় তুললেন। হাসপাতালে কান্নাকাটি করেছেন খুব। এখনও চোখ লাল।

—আপনার নাম?

—প্রিয়ব্রত বসু।

—বাবার নাম?

—স্বর্গীয় লালমোহন বসু।

—ঠিকানা?

—সুভাষ পল্লী।

—কী করেন আপনি?

—চাকরি। প্রাইভেট কোম্পানিতে।

কটা নাগাদ আপনি খবর পান? কার কাছে?

প্রিয়ব্রত ঢোক গিললেন। কান্না চাপার চেষ্টা করছেন। ফ্যালফ্যাল করে নোটনের দিকে তাকালেন।

নোটন বলে উঠল,—আমরা তপুদিকে নিয়ে হাসপাতালে যাবার সময় ভানুকে খবর দিয়ে যাই। ভানুই মেসোমশাইকে নিয়ে হাসপাতালে....

—তুমি চুপ করো। ডিউটি অফিসারের গলা রূঢ় হল আবার,—যা বলার উনিই বলতে পারবেন। বলেই গলাটাকে পোষ মানিয়ে নিয়েছেন,

—আপনার মেয়ের কি কারুর সঙ্গে ভাবসাব ছিল? মানে কোনও অ্যাফেয়ার?

প্রিয়ব্রত দুদিকে মাথা নাড়লেন।

—আপনি সিওর?

এবার বেশ অসহায় বোধ করলেন প্রিয়ব্রত। অনুতোষ তাঁর পিঠে হাত রাখলেন। মনে মনে বিরক্ত। এই মুহূর্তে মানুষটাকে এসব প্রশ্ন না করলেই কি নয়!

—কাউকে সাসপেক্ট করেন আপনি?

প্রিয়ব্রত আবারও দুদিকে মাথা নাড়লেন। ধরা গলায় বললেন,—মেয়েটা জন্মেছে এখানে। বড় হয়েছে এখানে। সবার সঙ্গে চেনাজানা, মেলামেশা, কাকে সাসপেক্ট করব?

বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছেন। বাবলু সঙ্গে সঙ্গে তার দুকাঁধ চেপে ধরেছে।

বাইরে থেকে একটা কনস্টেবল এসে জানান দিল, —বড়বাবু আসছেন

কোয়ার্টার থেকে।

মুহূর্তে ডিউটি অফিসার সচকিত। মেজবাবুও নড়ে চড়ে বসেছে সামান্য। কালো প্যান্টের ওপর নীল বুশ শার্ট চড়িয়ে এসেছেন ভদ্রলোক। চোখ দেখে বোঝা যায় ঘুম থেকে ডেকে তোলা হয়েছে। ঘরে ঢুকে অনুতোষদের এক ঝলক দেখে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন। গিয়েই বেল বাজিয়েছেন। ডিউটি অফিসার উঠে গেলেন। মেজ দারোগার ডাকে পেছন ফিরলেন অনুতোষ।

—আপনি কে হন ওনার?

—পুরনো বন্ধু। প্রতিবেশী।

—আপনি আদর্শ বিদ্যাপীঠে পড়ান না?

অনুতোষ বেশ অবাক হলেন। পুলিশ দারোগারা বোধহয় সব খবর রাখে। প্রশ্ন করেই আড়মোড়া ভাঙল বড় করে,

—দেখুন আপনারই কোন ছাত্র...

কী ইঙ্গিত করতে চায় লোকটা? অনুতোষ বেশ আহত বোধ করলেন। এই তো ভানু, নোটন, বাবলু এরাও তাঁর ছাত্র। এদেরই মত কেউ...। ভাবতেও নিজের ওপর ঘৃণা আসে। দু আঙুলে কপাল টিপে ধরলেন।

ভানু নোটন আর বাবলু দেওয়ালের গায়ে রাখা খালি বেঞ্চিটাতে বসে পড়ল। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। শ্রান্তি আসছে অনুতোষেরও। কতক্ষণে এখান থেকে বেরোন যাবে কে জানে!

ডিউটি অফিসার ওসির ঘরের পর্দা সরিয়ে মুখ বাড়াল,—আসুন আপনারা। স্যার ডাকছেন ভেতরে।

ওসির টেবিলের পেছনে ব্ল্যাক বোর্ড টাঙানো একটা। চক দিয়ে ঘর কেটে বিভিন্ন রকম অপরাধের পরিসংখ্যান লেখা সেখানে। গোটা বছরের সালতামামি। টেবিলে কাচের নিচে মা কালী। ছবি ঘিরে অজস্র ভিজিটিং কার্ড। দেওয়ালে দামি বিদেশি ক্যালেন্ডার ঝুলছে। টেলিফোন রাখার বাক্সটার গায়ে এক দাড়িওলা সন্ন্যাসীর ছবি। কনস্টেবল ঢুকে আরও একটা হ্যারিকেন রেখে গেল।

প্রিয়ব্রতদের হাত দেখিয়ে চেয়ারে বসতে বললেন ভদ্রলোক।

—আপনার মেয়ের জ্ঞান ফিরেছে?

প্রিয়ব্রত এতক্ষণে অনেকটা সামলে নিয়েছেন নিজেকে। নীচুস্বরে উত্তর দিলেন,

—ঘুমের ইন্‌জেকশন দিয়েছে।

—ঠিক আছে। কাল আমি নিজে হাসপাতালে যাব। নিজে শব্দটার ওপরে জোর দিলেন ভদ্রলোক,—আপনার মেয়ের সঙ্গে কথা বলে আসব। নিশ্চিন্ত থাকুন।

অনুতোষ বলে উঠলেন,—বদমাইশগুলো ধরা না পড়া পর্যন্ত...

—কিছু ভাববেন না। ধরা পড়বেই। পালাবে কোথায়? বলতে বলতে উদাস হয়েছেন,—আসলে কী জানেন তো...চারদিকে এত ইন্ডাস্ট্রি ফিন্ডাস্ট্রি গজিয়ে উঠছে... আর এসব বদমাইসও বাড়ছে। এই তো ফেব্রুয়ারিতে যে কেসটা হয়ে গেল। মেয়েটার চালচলন অবশ্য খুব ভাল ছিল না...। প্রোভোকেটিভ। পোশাক আশাক যা পরত! সেই ছেলেগুলোকে তো চালান করে দিয়েছি।

প্রিয়ব্রত বলতে গেলেন,—আমার মেয়ে তো সেরকম...

ওসি থামিয়ে দিলেন, —না, না, আমি তা বলিনি। আপনারা স্টেটমেন্টগুলো সব সই করে বাড়ি চলে যান। কাল সকালে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

কাজ সেরে বেরোতে বেরোতে তিনটে বাজল। থানার সেন্ট্রি লম্বা বারান্দার ঘণ্টাটাকে বাজাল ঢং ঢং। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে আবার। বাবলু নর্দমার ধারে গিয়ে হুড়হুড় করে বমি করে ফেলল, নোটন ভানু দৌড়ে গিয়ে ধরল তাকে। সামনের টিউবওয়েলের কাছে নিয়ে গিয়ে ঘাড় মাথা ধুইয়ে দিল ভাল করে। প্রিয়ব্রতর বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। অনুতোষের হাত খামচে ধরলেন। আকস্মিক ভাবে স্ত্রীর মুখটা ভেসে উঠেছে চোখের সামনে। কোন মুখ নিয়ে গিয়ে দাঁড়াবেন এখন বাবলুর মা'র সামনে? এতদিনকার নিশ্চিন্ত সংসার...ছেলে ...মেয়ে। গোটা পৃথিবী দুলতে শুরু করেছে। মস্তিষ্কের অবশ ভাব কেটে এখন শুধুই তোলপাড়। হাঁটু দুটো ক্রমে আরও দুর্বল হয়ে গেল। ভেজা রাস্তার বুকে উবু হয়ে বসে পড়লেন প্রিয়ব্রত।

১লা মে বিকেল চারটে

বিকেলে হাসপাতালে এসে খবর পেলেন প্রিয়ব্রত ও শোভনা। ও সি কথা রেখেছেন। নিজেই এসেছিলেন সকালে।

দোতলায় এমারজেন্সি ওয়ার্ডের একেবারে শেষ বিছানায় পাশ ফিরে শুয়ে আছে সুতপা। জানলার দিকে মুখ। শোভনা প্রায় উদভ্রান্তের মত ছুটে গেলেন মেয়ের কাছে। কাল থেকেই মেয়েকে একবার চোখের দেখা দেখার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। সকালেও হাসপাতালে আসতে চেয়েছেন। বাবলু আসতে দেয়নি। প্রিয়ব্রতকেও না।

—তোমরা এখন আর গিয়ে কী করবে? ভিজিটিং আওয়ার ছাড়া কাছে গিয়ে বসতেও পারবে না। তাছাড়া আমি তো খোঁজ নিয়ে এলাম। দিদি অনেকটা ভাল আছে এখন।

মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে বাবলু যেন কত বড় হয়ে গেছে। ষোল বছরের কিশোর হঠাৎই এক রাতে প্রাপ্ত যুবক। সকাল থেকে সামাল দিচ্ছে সব দিক। বাড়িতেও লোক আসার বিরাম নেই। পাড়াপ্রতিবেশীরা সকলেই একবার করে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। যে কোনদিন বাড়িতে আসে না, সেও। সান্ত্বনা আর আফশোসের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে হাজার পরামর্শ। অযাচিত বুদ্ধি দান। অকারণ কৌতূহল।

—অমন সুন্দর মেয়েটার কত বড় সর্বনাশটা হয়ে গেল...

—আহা, কি হাসিখুশি ছিল মেয়েটা...। বিয়ের যুগ্যি মেয়ে..কি যে হবে এখন?

—ওকে ওরকম সন্ধেবেলা টিউশনি করতে যেতে দিতেন কেন দিদি? জানেনই তো কী দিন কাল...।

—হায় হায়। অত বুদ্ধিমতী হয়েও তপু এমন ভুলটা করল কী করে? ওইরকম অন্ধকারে জলঝড় মাথায় নিয়ে একা একা ফেরার সাহস করতে আছে?

—কজন মিলে কাজটা করেছে কিছু বোঝা গেল?

—এসব হল বেশি হিন্দি সিনেমা দেখার ফল। আজকাল তো ভায়োলেন্স, রেপ ছাড়া ফিল্মই হয় না।

—যা বলেছেন।

এখনও আরও আত্মীয়-স্বজনরা জানতে বাকি আছে। তারা এসে আরও কি বলে! সকলেরই কথার ভাবে মনে হয় দোষের ভাগী বুঝি সুতপাও কিছুটা। দোষ সন্ধেবেলা টিউশনি করতে যাওয়ার। দোষ একা একা বাড়ি ফেরার। দোষ হিন্দি সিনেমার। কেউ একবারও বলছে না একটা সভ্য দেশে কেন একটা সভ্য মেয়ের স্বাধীনভাবে চলা ফেরা করার অধিকার থাকবে না। মনে হয় এটাই যেন স্বাভাবিক নিয়ম। পুরুষের সমাজে পাশবিক হয়ে ওঠার অধিকার একমাত্র পুরুষেরই আছে। মেয়েরা তো শুধুই ভোগের জন্য। কলঙ্কিত হওয়ার জন্য। সিনেমা থিয়েটারের উত্তেজক দৃশ্য মানুষের প্রথম রিপুটাকে তাতিয়ে তুলতেই পারে। সেই কারণেই শুধু পশুর থেকেও পাশবিক হয়ে উঠতে পারে মানুষ?

না। কেউ চিন্তা করে দেখছে না সেভাবে। প্রিযব্রতও না। বাবলুও না। প্রিযব্রত শুধুই ভেতরে ভেতরে ভাঙছেন আরও। বাবলু ক্ষুব্ধ। আহত। একমাত্র শোভনাই লক্ষ প্রশ্নের ঝাপটায় বারবার আছাড় খেয়ে পড়ছেন। সেই কাল রাত থেকেই। প্রবল বন্যার তোড়ে ভেসে যাচ্ছেন অসহায়। প্রথমটা শোনার পর মাথা সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। শরীরের সমস্ত শক্তি যেন হারিয়ে ফেলেছিলেন। তপুকে নয়, কেউ যেন তাঁকেই পিষে থেঁতলে চলে গেল। এরপর মেয়ের বিয়ে দেবেন কী ভাবে? কোন ভবিষ্যত নিয়ে বাঁচবে মেয়েটা? কাল অনেক রাত পর্যন্ত

অনুতোষবাবুর স্ত্রী ছিলেন পাশে। অনুতোষবাবুর মেয়ে ঝর্ণাও। ঝর্ণা কাঁদছিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিল। শোভনা নিশ্চল বসে ছিলেন। কোন দোষে এত বড় শাস্তিটা পেল তপু? আর কি কোনওদিন স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবে? এ সময় মেয়েটার পাশে থাকতে পারলে ভাল হত। তপুর এখন মাকেই দরকার বেশি। যত ভেবেছেন উদভ্রান্ত হয়েছেন তত। ছটফট করে মরেছেন।

মেয়ের পায়ের দিকে খাটের রেলিঙ আঁকড়ে দাঁড়িয়ে আছেন প্রিয়ব্রত। শোভনা হাত রাখলেন মেয়ের গায়ে। মেয়ে কেঁপে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে। কেঁপেই স্থির।

লম্বা টানা ওয়ার্ডের সব কটা বিছানাতেই রুগি। নানান বয়সের। মাটিতেও তোষককম্বল পেতে শুইয়ে রাখা হয়েছে অনেককে। সকলের কাছেই বাড়ির লোক আসতে শুরু করেছে ধীরে ধীরে। ক্রমে ভিড় বাড়ছে। গুনগুন শব্দ ভাসছে গোটা হল ঘরটা জুড়ে।

শোভনা খুব আস্তে ডাকলেন,

—তপুউ...তপু...

সুতপা ফিরল না। জানলার বাইরে যেটুকু আকাশ দেখা যাচ্ছে সেদিকে নিষ্পলক তাকিয়ে আছে। বোবা, বোধহীন দৃষ্টি। কাল রাতের পর থেকে একটুও কাঁদতে পারেননি শোভনা। এখন হঠাৎ দুচোখ ভিজে গেল। স্বামীর দিকে তাকালেন। কান্না চাপবার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন তিনিও। হু হু করে চোখ বেয়ে কিছু ঝাপসা ছবি ভেসে গেল...

... তীব্র যন্ত্রণায় হাসপাতালে ছটফট করছেন শোভনা। প্রথম সন্তান আসছে। গর্ভ ছিঁড়ে। গোটা শরীর তোলপাড় করে। দুদিন তিন রাত ধরে সে কী অসহ্য যন্ত্রণা। একসময় বিচ্ছিন্ন হল শরীর থেকে। শালিখ ছানার মত এত্তটুকুন। লালচে রঙের। মাথায় শুঁয়ো শুঁয়ো চুল। আধফোটা চোখ। এত ছোট যে প্রিয়ব্রত কোলে নিতে ভয় পেতেন। শোভনাও কি পারেন ভালভাবে সামলাতে! মাঝেমাঝেই ট্যাঁ ট্যাঁ করে কেঁদে উঠছে শালিখছানা। শোভনা কোলে তুলে দুধ খাওয়াচ্ছেন। আনাড়ি মায়ের মতো। মা হাঁ হাঁ করে উঠল দেখে,—ওভাবে নয় রে বোকা। ওভাবে চেপে ধরলে শ্বাস বন্ধ হয়ে মরে যাবে সে। দুই স্তন কটকট করে উঠল। অদ্ভুত এক অচেনা যন্ত্রণা। এক বুকে শিশুমুখ রাখলে অন্য বুক ভেসে যায় দুধে। দুধ? না রক্ত? রক্তই কি দুধ হয়ে বেরিয়ে আসে?

...দৃশ্য বদলে গেল। বাপের বাড়ির থেকে তিন মাসের মেয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন শোভনা। শালিখছানা প্রতিদিন একটু একটু করে বড় হচ্ছে। আধন্যাড়া মাথায় চুল গজালো। পাতলা পাতলা। নরম নরম। দেখতে দেখতে গোলগাল

ডলপুতুল একটা। শোভনা সারা দিন ব্যস্ত মেয়ে নিয়ে। ছেলেবেলার পুতুল খেলার দিনগুলো ফিরে এসেছে যেন। এবার খেলার সঙ্গী প্রিয়ব্রত। পালা করে রাত জেগেছেন দুজনে। কাঁথা পাল্টাচ্ছেন। দুধ খাওয়াচ্ছেন বোতলে করে। ক্রমশ বেড়ে উঠছে মেয়ে। এই বসা শিখল। এই হাঁটা। আধো আধো বুলি ঠোঁটে। ...দৃশ্যপট বদল আবার। মেয়ে প্রথম স্কুল যাচ্ছে বাবার হাত ধরে। তুলতুলে পাখির ছানা ডানা মেলে উড়তে শিখছে প্রথম। বাবা মা'র হাত ধরে এক চোখে খুশি চিকচিক। অন্য চোখে ভয়।...

সেই মেয়ে দেখতে দেখতে কবে যে এত বড় হয়ে গেল। চাঁদের কলার মত বাড়তে বাড়তে পরিপূর্ণ নারী কখন। স্কুল পাশ করে কলেজ গেল। বি এ পাশ করে মাস দুয়েক হল শর্টহ্যান্ড টাইপিংয়ে ভর্তি হয়েছিল। টিউশনিও ধরেছিল গোটা দুয়েক। প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে ভাইয়ের জন্য ঘড়ির ব্যান্ড কিনে এনেছিল। শোভনার জন্য এক শিশি পারফিউম। বাবার জন্য আফটার শেভ।

প্রিয়ব্রত হেসেছিলেন,—এসব কি আমার সহ্য হবে রে? এই বয়সে? ছাপোষা মানুষ। এসব কোনওদিন আমাকে ব্যবহার করতে দেখেছিস?

মেয়ে চোখ পাকিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে,—ছাপোষা মানুষদের বুঝি শখ-আহ্লাদ থাকতে নেই?

—তা নয়। কোনওদিন তো এসব মাখিটাখিনি। সেই আঠারো বছর বয়স থেকে দাড়ি কামানো ধরেছি। বাহান্নোয় পা দিলাম। এখনও সেই আদি অকৃত্রিম ফটকিরি। মাঝেমধ্যে শীতকালে একটু যা ক্রিমট্রিম লাগাই। তাও তোর মার পাল্লায় পড়ে। কেটে গেলে স্যাভলন। ডেটল।

—এবার থেকে অ্যাটোমাইজার লাগাবে। ফুরোলে আবার কিনে দেব।

শোভনা হেসেছিলেন চোখ টিপে,—ও। বাবার বেলাতে কিনে দেব। আর আমারটা যে নিজে কিনে নিজেই মেখে শেষ করছিস। তার বেলা?

—তুমি মাখো না কেন? মাখলেই পারো। শেষ হলে তোমারও আসবে। বলতে বলতে মাথা দোলাচ্ছে,—দাঁড়াও না। একটা চাকরি পেয়ে নিই, তখন দেখবে তোমাদের দুজনকেই....

—আর তোমাকে আমাদের দেখে কাজ নেই। এবার ভালয় ভালয় পার করতে পারলে বাঁচি।

—ওফ্। তোমাদের এখনও কী সব প্রিমিটিভ আইডিয়া। মেয়ে মানেই আগে বিয়ে। কোনরকমে ঘাড় থেকে নামিয়ে ফেলা।

এরকমই পাকাপাকা কথা চিরটাকাল। সেই ছোট্ট থেকেই। সারাদিন হৈচৈ

করে বেড়াচ্ছে। কারণে অকারণে হাসি খিলখিল। আর ভাইয়ের সঙ্গে খুনসুটি। প্রায়ই মারপিঠ। হাতাহাতি। পরক্ষণেই ভাব আবার। আর কি কোনওদিন হাসতে পারবে সেভাবে? বাবলুও কি...

শোভনা আলগোছে চোখের কোলে জমা বাষ্পটুকু মুছে নিলেন। মেয়ের গায়ের কাছে, বিছানায় উঠে বসলেন।

—শোন। মন খারাপ করিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

প্রিয়ব্রতও এগিয়ে এসে হাত রাখলেন মেয়ের মাথায়,

—ভয় পাস না। আমরা আছি তো।

বলতে বলতে স্বর কেঁপে গেছে। মেয়ের ব্যাপারে প্রিয়ব্রত চিরদিনই বড় দুর্বল। শোভনার থেকেও। শোভনা একবার স্বামীকে দেখে নিয়ে আবার মেয়ের দিকে ফিরলেন। দৃঢ় হল গলার স্বর,

—তুই ভয় পাবি কেন? লজ্জাই বা কিসের? অন্যায় তো তুই করিস নি। যারা করেছে...

সুতপা আচমকা ফিরে মুখ গুঁজে দিল মায়ের কোলে। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কান্নার দমকে গোটা শরীর ফুলে ফুলে উঠছে। শোভনা হাত বোলাচ্ছেন মেয়ের পিঠে। কাঁদুক। প্রাণভরে কেঁদে নিক। কান্নায় গ্লানি অনেক ধুয়ে যায়। প্রিয়ব্রত মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। জানলাব বাইরে তাকিয়ে সামলাচ্ছেন নিজেকে।

পাশের বেডের মহিলাটি তখনই খবরটা দিলেন। খাটের পিঠে হেলান দিয়ে আপেল চিবোতে চিবোতে বলে উঠলেন,

—আজ বেলায় পুলিশ এসেছিল। সব জেনে নিয়ে গেছে।

প্রিয়ব্রত চমকে তাকালেন, —এসেছিল?

—হ্যাঁ। অনেকক্ষণ ধরে কথা বলল আপনার মেয়ের সঙ্গে।

প্রিয়ব্রতর মুখ থেকে আপনাআপনি বেরিয়ে এল, —কী বলল?

—তা অত বলতে পারব না। পর্দা টেনে দিয়ে কথা বলছিল। নার্স বলল, বড় দারোগা।

পর্দা যদি এখনও টেনে দেওয়া যেত। অনেকেই ঘুরে ঘুরে দেখছে এদিকে। দুএকজন তো অসভ্যর মতো একেবারে সামনে এসে হাঁ করে দেখে যাচ্ছে। যেন কোনও বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছু। যে মহিলাটি কথা বলছেন তাঁরও বলার ভঙ্গি খুব শোভন নয়। তাঁর পাশে টুলে বসা রোগা মতন যুবকটি প্রশ্ন করে উঠল,

—পুরো রেপ করেছে? না ট্রাই নিয়েছিল?

মহিলা চটপট উত্তর করলেন,—না। না। পুরোই। কাল রাত্তিরে কী অবস্থায় না এসেছিল...রাতভর কী কাঁপুনি...গ্যাজলা বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে।

মেয়েরও নিশ্চয়ই কানে যাচ্ছে কথাগুলো। কান্না থেমে গেছে। শোভনা টের পেলেন শরীর ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠছে মেয়ের। ওর সামনে এসব কথা কি জোরে জোরে না বললেই নয়? এতটুকু জ্ঞানগম্যি থাকবে না মানুষের? নাকি এও এক ধরনের নিষ্ঠুরতা। যা মানুষই করতে পারে।

বিরক্ত মুখে স্বামীর দিকে তাকালেন শোভনা। চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন,

—তপুকে এখন বাড়ি নিয়ে যাওয়া যায় না?

প্রিয়ব্রতও বিরক্ত হয়েছেন। অন্যের ব্যাপারে মানুষ কেন যে এত কৌতূহল দেখায়! একজনের যন্ত্রণা আরেকজনের কাছে মুখরোচক খোরাক হয়ে ওঠে। দুটি মেয়ে এগিয়ে এসে এবার উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে সুতপাকে। মেয়েকে আড়াল করে দাঁড়ালেন,

—ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে দেখি একবার। একটা কেবিনের ব্যবস্থা যদি করা যায়...

—না। তুমি বন্ড সই করে দাও। ওকে আমি নিয়ে যাব। আজই।

শোভনা দুহাতে মেয়েকে বুকের কাছে টেনে নিলেন। আরও ভাল করে। পারলে আঁচল দিয়ে ঢেকে দেন।

প্রিয়ব্রত যেতে গিয়েও ফিরে দাঁড়ালেন। ওসির কাছে তপু কি নাম বলতে পেরেছে শয়তানগুলোর? অ্যারেস্ট হয়েছে তারা? ডাক্তার নার্সরা কি কিছু বলতে পারবে? শোভনাকে বাড়ি পৌঁছে থানায় যেতে হবে একবার। তাঁর মেয়ের এমন অবস্থা যারা করেছে তাদের তিনি কিছুতেই ছাড়বেন না।

সুতপার শরীর এখনও শক্ত হয়ে আছে। শোভনা মেয়ের মুখের কাছে কান নিয়ে গেলেন,

—কারুর কথায় কান দিস না তপু। মনে সাহস আন। ভেঙে পড়লে পাঁচজনে আরও পেয়ে বসবে। মজা করবে তোকে নিয়ে।

সুতপা দুহাতে শোভনার কোমর আঁকড়ে ধরল।

শোভনা গলা আরও নীচু করলেন,

—চিনতে পেরেছিলি তাদের? ভয় পাস না। বল আমাকে। চিনিস?

মেয়ে অনেকক্ষণ পর মুখ তুলল কোল থেকে। বিছানায় টানটান হয়ে শুল। শোভনা শিউরে উঠলেন। মেয়েব দু'গালে চাকাচাকা দাগ দাঁতের। হিংস্র নখের। ওপরের ঠোঁট ভীষণভাবে ফুলে উঠে ঢেকে দিয়েছে নীচের ঠোঁটকে। চোখের তলায় ঘন কালসিটে। আরও কত দাগ পড়েছে এরকম? কোনওদিন উঠবে এ দাগ মেয়ের শরীর থেকে? বুকের মধ্যে জমে থাকা গুমোট ভাব ঝড় হয়ে উঠতে চাইছে। তবু সংযত থাকতেই হবে। চাদর টেনে ভালভাবে ঢেকে দিলেন মেয়ের

শরীর। মেয়ে চোখ বুজে রয়েছে। দুগাল বেয়ে নিঃশব্দে গড়িয়ে যাচ্ছে জলের ধারা। কানের পাশ বেয়ে টপটপ গড়িয়ে গেল বালিশে। নীচে একটা সাইরেনের মতো শব্দ শোনা গেল। কোনও অ্যাম্বুলেন্স ঢুকল বোধহয়।

শোভনা দুহাতে মুখ ঢেকে ফেললেন। মেয়েকে আর একটা কথাও জিজ্ঞাসা করতে পারলেন না।

১লা মে মধ্যরাত

কাল রাত থেকে দুচোখের পাতা এক হয়নি একবারও। আজও ঘুম আসবে না। পাশে জেগে আছে শোভনাও। থেকে থেকে স্ত্রীর দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন প্রিয়ব্রত। এ নিশ্বাস ঘুমের নয়। প্রিয়ব্রত বুঝতে পারছেন। সন্ধেবেলা হাসপাতাল থেকে ফেরার পর কারুর সঙ্গে একটা কথা বলেননি শোভনা। কাল সকালে মেয়েকে বন্ড সই করে না নিয়ে আসা পর্যন্ত বলবেনও না। প্রিয়ব্রত জানেন। ফিরে এসে জল পর্যন্ত খাননি। ঘর অন্ধকার করে শুয়ে পড়েছেন। প্রিয়ব্রতর বুকটা টনটন করে উঠল। তপুকে তিনি কি কম ভালবাসেন? শোভনার থেকে কি কম আঘাত পেয়েছেন তিনি?

সন্ধেবেলা শোভনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে একা একাই গিয়েছিলেন থানায়। থানার চেহারা তখন একেবারে অন্যরকম। বিকেলের মুখে কারেন্ট এসে গেছে। কাল রাতের ঘরখানায় হাই পাওয়ারের আলো জ্বলছে গোটা দুয়েক। লো ভোল্টেজের জন্য মাঝে মাঝে ম্রিয়মাণ হয়েও উজ্জ্বল হচ্ছে দপ করে। ঘটাং ঘটাং শব্দ করে মাথার ওপর ঘুরে চলেছে আদ্যিকালের দুটো ঢাউস ফ্যান। দেওয়ালে ঝোলানো আর টি বক্স থেকে ভৌতিক স্বর বেজে চলেছে একটানা। জড়ানো স্বরে। কান পেতে থাকলেও এক বর্ণ বোঝা যায় না। ঘরের কেউ শুনছেও না সেভাবে। মেজ দারোগা আর ডিউটি অফিসারটি ছাড়া আরও দুজন অ্যাসিসট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর কালকের ফাঁকা টেবিল চেয়ারে। বেঞ্চিটাও পরিপূর্ণ। এক মহিলা আর জনা তিনেক পুরুষ উবু হয়ে বসে আছে মাটিতে। বোধহয় ফ্যাক্টরির লেবার টেবার। প্রিয়ব্রত ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েই শুনতে পেলেন মেজ দারোগা তাদের উদ্দেশে বলে উঠল,

—বডি কী করে পাবি এখন? মর্গে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

গরিব মতন বউটি কেঁদে উঠল হাউ হাউ করে। একটা লোক টেবিলের তলা দিয়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল দারোগার পায়ের ওপর। দারোগা নির্বিকার,

—পায়ে পড়ে কী হবে? বললাম তো কাল পাবি। এখন বাড়ি যা। বলতে

বলতে দাঁতের ফাঁকে নখ ঢোকাল। খাবারের কুচি বার করে ফেলল থু থু করে,

—যা। যাহ্। আর জ্বালাস না এখন।

একটা মানুষের মৃত্যু, একটা মানুষের লাশ কত সহজ ঘটনা পুলিশ ডাক্তারদের কাছে। ডাক্তারদের থেকেও পুলিশরা বোধহয় এসব ব্যাপারে বেশি উদাসীন। বেশি নির্মম। সবসময় দেখে দেখেই হয়ত। প্রিয়ব্রত থমকে দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক সেকেন্ড। বেঞ্চিতে মাথায় পট্টি বেঁধে বসে বাবলুরই বয়সী একটা ছেলে। তাকে চেপে ধরে রয়েছে দুজন। ডিউটি অফিসারটির সামনে বসে আরও দুজন রিপোর্ট লেখাচ্ছে। লিখতে লিখতে কাল রাতের ছোকরা অফিসারটি চোখ তুলে একবার দেখল প্রিয়ব্রতকে। চিনতে পারল না যেন। প্রিয়ব্রত তার টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন,

—আমি কাল রাতে এসেছিলাম।

—হুঁ। বলুন।

—ওসি নেই শুনলাম। বেরিয়ে গেছেন। আমি একটু আপনার সঙ্গে...

—আপনার কেসটা বড়বাবু টেকআপ করেছেন। ওনার সঙ্গে কথা বলবেন।

—কখন ফিরবেন উনি?

—বলতে পারছি না। রাত হতে পারে। এস-পিকে মিট করতে গেছেন।

প্রিয়ব্রত তবু একটু ইতস্তত করলেন। বসবেন একটু? যদি এসে যান? কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বাইরের করিডোরে এলেন। দুজন কন্সটেবল বাইরে বেঞ্চিতে বসে খৈনি টিপছে। প্রিয়ব্রতকে দেখে জিজ্ঞাসা করল,

—আপনার সেই রেপ কেস তো?

প্রিয়ব্রত অন্যমনস্ক ভাবে মাথা নেড়ে ফেললেন। পৃথিবীসুদ্ধ লোক বোধহয় এতক্ষণে জেনে গেছে প্রিয়ব্রত বসুর মেয়ে ধর্ষিত হয়েছে। বাড়ির দিকে আসার সময় নতুন বাজারের সেই ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। প্রিযব্রতর সঙ্গে একসঙ্গে ট্রেনে অফিস যান। আলাপপরিচয় আছে। ঘনিষ্ঠতা নেই তেমন। ভদ্রলোক নিজেই এগিয়ে এলেন,

—কি দাদা? এদিকে কোথায় গিয়েছিলেন?

প্রিয়ব্রত ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝে নিতে চাইলেন ইনিও কিছু জানেন কি না।

—এই একটা কাজে...।

—অফিস যাননি আজ?

—না। প্রিয়ব্রত নিশ্চিন্ত মনে হাসলেন সামান্য। অনেকক্ষণ পর। তখনই ভদ্রলোক দুম করে প্রশ্ন করেছেন, —আপনি সুভাষ পল্লীতে থাকেন না? কাল

রাত্রে ও পাড়ার একটা মেয়ে নাকি রেপড হয়েছে? চেনেন নাকি?

প্রিয়ব্রত ঢোক গিললেন। মুখ পলকে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটছে কেউ। কোনরকমে মাথা দোলালেন, —হ্যাঁ...

—কালপ্রিটরা ধরা পড়েছে কেউ?

—না। প্রিয়ব্রত আমতা আমতা করে বলে ফেললেন,—পড়বে। ধরা পড়তেই হবে।

মশারির মধ্যে ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে গেলেন প্রিয়ব্রত। আকাশে এক ফোঁটাও মেঘ নেই আজ। তবু এত গরম। মধ্য বৈশাখ উত্তাপ ছড়িয়ে রেখেছে চারদিকে। টিকিস টিকিস করে ফ্যান চলছে। ফ্যানের হাওয়া গায়ে লাগছে না। ঘাড় ঘুরিয়ে অন্ধকারে শোভনাকে দেখার চেষ্টা করলেন। জানলা দিয়ে যেটুকু আলো আসছে তাতে ঘর জুড়ে ঠিক অন্ধকার নয়, আবছায়া। মশারি তুলে নেমে পড়লেন। জল খাবেন। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। মশারির চালে রাখা বেড সুইচ টিপতে গিয়েও টিপলেন না। থাক। শোভনার অসুবিধে হবে। ডাইনিং স্পেসে এলেন। ডাইনিং স্পেস বলতে সরু লম্বাটে খাওয়া দাওয়া করার জায়গা এক ফালি। ওপাশে তাঁদের ঘরের মুখোমুখি বাইরের ঘর। তার পাশের ঘরটা বাবলু সুতপার। এ পাশে রান্নাঘর। বাথরুম। সাড়ে আটশো স্কোয়ার ফুটের এই বাড়িটুকু তুলতে দেনা হয়ে গেছে অনেক। অফিস থেকে প্রতিমাসে লোনের জন্য বেশ মোটা টাকা কাটা যায়। তাও এখনও বাইরেটা প্লাস্টার করতে পারেননি। আগের বর্ষাতে প্রায় সব কটা ঘরে জায়গায় জায়গায় ড্যাম্প ধরেছে।

শোভনা বলেন,—থাক যেমন আছে। তপুর বিয়েটা আগে হয়ে যাক। তারপর দেখা যাবে। এখন কিচ্ছুতে আর হাত দিতে হবে না।

মেয়ের বিয়ের জন্য বছর দুয়েক ধরেই তাগাদা লাগাচ্ছেন শোভনা। প্রিয়ব্রত খুব একটা গা করেননি কোনওদিনই। খালি মনে হয় আর কটা দিন যাক। মেয়ে শ্বশুড়বাড়ি চলে গেলে বাড়িটা ফাঁকা হয়ে যাবে যে। তাছাড়া টাকা পয়সাও তো দরকার। আর টাকা পয়সা! মেয়েটার কোনওদিন বিয়ে হবেই কি না কে জানে। উদার মানুষ কটা আছে পৃথিবীতে? প্রিয়ব্রত ডাইনিং টেবিল থেকে জগ তুলে অনেকটা জল খেয়ে নিলেন ঢক ঢক করে। বাইরে দু তিনটে কুকুর একসঙ্গে ডেকে উঠল। খসখস শব্দ হল কিসের। দরজায় আলগাভাবে টোকা দিল কেউ। ডাইনিং স্পেসের দরজায় নয়। বাইরের ঘরের দরজায়। আবার শব্দ হল। এবার বেশ জোরে। কে এল এত রাতে? তপুর কি বাড়াবাড়ি কিছু হয়ে গেছে? হাসপাতাল থেকে খবর এল? সুখেন্দুবাবু ফোন নম্বর দিয়ে এসেছেন হাসপাতালে। সুখেন্দুবাবুদের বাড়ি থেকে কি কেউ...! নাকি...! অজানা আশঙ্কায় প্রিয়ব্রতর বুক

৩০ শে এপ্রিল রাত দুটো

...ইটস্ আ কেস অফ গ্যাংরেপিং উইথ সিভিয়ার ইনজুরিজ অন প্রাইভেট পার্টস... দা পেশেন্ট ওয়াজ ব্রট টু এমারজেন্সি অ্যাবাউট টেন থার্টি পি এম ইন আ সেমিকনশাস কন্ডিশন উইথ ডিপ মেন্টাল শক অ্যান্ড ইনজুরিজ অন হার বডি... অন এপ্রিল...

রীতিমত চিৎকার করে মেডিক্যাল রিপোর্ট পড়ছে ডিউটি অফিসার। অত জোরে পড়ার দরকার নেই তবুও। পড়তে পড়তে অন্য টেবিলে বসা মেজ দারোগার দিকে তাকাল,

—আবার একটা কেস ঘোষালদা। দু'মাসের মধ্যে অ্যানাদার কেস অফ মাসরেপিং।

রিপোর্টটা শোনাব সময়ই মেজ দারোগা নড়ে চড়ে বসেছিল। এবার টানটান হল।

—কোন জায়গায় হল?

—বলছে তো স্টেশন রোডের ওপবেই।

—লিখে নে।

—লিখব?

—লেখ।

পুরনো আমলের কড়িবরগাঅলা বড় সড় ঘরে গোটাচারেক লণ্ঠন জ্বলছে। জানলাগুলো সব তারজালে ঘেরা। সেই জালের ওপর এলোমেলো আলো পড়ে ভুতুড়ে ছায়া তৈরি হয়েছে কয়েকটা। প্রিয়ব্রত ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে আছেন সেদিকে। ডিউটি অফিসার তাঁর দিকে তাকাল এতক্ষণে,

—আপনার মেয়ে?

শুনেও শুনতে পেলেন না প্রিয়ব্রত। তাঁর হয়ে অনুতোষ উত্তর কবলেন.

—হ্যাঁ স্যাব। এনারই মেয়ে।

—আর এরা?

—এটি এনার ছেলে। এরা দুজন ওরই বন্ধু। পাড়ারই। ভানু আর নোটন।

ডিউটি অফিসারের জটিল চোখ বাবুলকে ছুঁয়ে অন্য দুজনকে জরিপ কবল ভালভাবে। দৃষ্টি দেখে মনে হয় অপরাধীদের দেখা মাত্র চিনে ফেলেছে।

বাবুল চোখ বন্ধ করে ফেলল। দিদির এখনও জ্ঞান ফেরেনি ভালভাবে। হাসপাতালের বেডে যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

ভানু নোটনের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ডিউটি অফিসার বাবলুর দিকে ফিরল,

—তুমিই তাহলে প্রথমে দেখতে পেয়েছ বলছ?

দাঁতে ঠোঁট চেপে বাবলু মাথা নাড়ল।

—কী নাম তোমার?

—বাবলু। সুমন ... সুমন বসু।

—আর কে ছিল তোমার সঙ্গে?

বাবলু নোটনের দিকে তাকাল। নোটন নিজেই বলে উঠেছে,

—আমি। আমি স্যার।

—তোমার কী নাম?

—নোটন হালদার।

—ওখানে তোমরা কী করতে গিয়েছিলে?

অদ্ভুত প্রশ্ন। নোটনের স্বর হোঁচট খেয়ে গেল,

—মানে স্যার....

—বলো। বলে ফ্যালো। ওখানে তোমরা কী করছিলে?

বলার ভঙ্গিতে বিশ্রী ইঙ্গিত যেন। বাবলুর মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। কী বলতে চায় লোকটা? নোটনকে থামিয়ে স্পষ্ট গলায় বাবলু কথা বলল এবার,

—দিদিকে খুঁজতে গিয়েছিলাম।

—কী দেখলে?

চোখের সামনে দৃশ্যটা আবার ভেসে উঠল নতুন করে। সে দৃশ্যের বর্ণনা কোনওদিন আর কাউকেই দিতে পারবে না বাবলু। দৃশ্য নয়, দুঃস্বপ্ন। সারাজীবনের মত গেঁথে গেছে বাবলুর বুকে।

বৃষ্টি থামার পর দিদিকে খুঁজতে বেরিয়েছিল। একটু বিরক্ত হয়েই। মা বাবা আজকাল অল্পেতেই এত বেশি চিন্তা শুরু করে।

গলির মুখে দেখা হয়ে গেল নোটনের সঙ্গে,

—কি রে কোথায় চললি?

—আর বলিস না। দিদিটা এখনও ফেরেনি। জলঝড়ে কোথাও আটকে গেছে বোধহয়। এদিকে বাবা জোর টেনশন শুরু করে দিয়েছে। মহারানিকে এখন এসকর্ট করে নিয়ে আসতে হবে।

—তোরই বা একটু এগিয়ে দেখতে অসুবিধে কোথায়?

—যাচ্ছি তো।

—চল। আমিও যাই।

নোটন সঙ্গী হল বাবলুর। দুজনে বড় রাস্তায় উঠল। আলো না থাকলে অত

বড় রাস্তাটাও কেমন ভূতের মত হয়ে যায়। শনিমন্দিরের পাশে, হরিপদদার দোকানে টিমটিম টেমি জ্বলছে। উল্টোদিকে কাপড়ের দোকান বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। সাইকেল সারানোর দোকানটাও। একটু হেঁটে পানদোকান থেকে দুটো সিগারেট কিনল নোটন। নতুন সিগারেট খাওয়া ধরেছে, মাধ্যমিক পরীক্ষার পর। নিজেরটা ধরিয়ে দড়িটা বাবলুর দিকে বাড়াল,

—নে। ধরা।

পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়েই টান দিতে লাগল দুজনে। এদিক ওদিক চোখ। চেনা লোক দেখলেই লুকিয়ে ফেলবে। শুক্লাদি আর শুক্লাদির বর ফিরল কোথ্‌থেকে। অর্ধেক খেয়ে সিগারেট নিভিয়ে দিল বাবলু। রেখে দে। ভাল্লাগছে না আর।

নোটন চোখ টিপল,—ভাল্লাগছে না? না ভয়? তপুদি এসে পড়বে।

—ধুস। ওকে কিসের ভয়। আই ডোন্ট কেয়ার। চল। একটু চা খাওয়া যাক।

—তপুদিকে খুঁজতে যাবি না?

—খোঁজার কী আছে? কচি খুকি নাকি? ঠিক টাইমলি এসে যাবে।

এভাবেই চা সিগারেটে সময় গেল বেশ খানিকক্ষণ। তখনও বাবলু ভাবতে পারেনি কত বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেছে ওই বড় রাস্তার ওপরেই। না। মেজদার দোকান থেকে বেরোনর পরেও না। তখনও ভাবছিল চৌধুরিবাগান দিয়ে যদি শর্ট কার্ট করে দিদি, তবে লাগবে পনেরো মিনিট। বড় রাস্তা দিয়ে এলে সময় বেশি লাগে। জল কাদার মধ্যে কি আর চৌধুরিবাগান দিয়ে আসবে? দিদি যথেষ্ট চালাক চতুর। ওরকম বোকামি করবে না।

সেজদার দোকান থেকে বেরিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত মনেই হাঁটছিল ওরা।

—হ্যাঁরে, এর মধ্যে পাস করে যায় নি তো?

—নাহ্‌। আমি নজর রেখেছিলাম।

নতুন ফ্ল্যাট বাড়িটা যেখানে তৈরি হচ্ছে তার আশপাশ বেশ ফাঁকা। সামনে অনেকটা মাঠ পড়ে আছে। দিব্যেন্দু সরকারের বাড়ির পাশে জমি কিনেছে দিদিদের কলেজের এক প্রফেসর। তার পাশে ভিত অবধি তুলে ফেলে রেখেছে বাজারের নটে মুখুজ্যে। তার পরেই দাঁত বার করা ফ্ল্যাটবাড়ির খাঁচা। ঠিক যেখানটায় বাড়িটা উঠেছে তার সামনে ঢালমতন আছে অল্প। ওখানে কেউ শুয়ে বসে থাকলে সহজে চোখে পড়ে না। বাবলুদেরও পড়েনি। বাড়িটা পেরিয়ে যাওয়ার পর মনে হল কেউ যেন হামাগুড়ি দিয়ে রাস্তায় উঠতে চাইছে। কে ওখানে! কী হয়েছে! কী করছে অত রাতে! সামনে এগিয়ে দেখতে গিয়ে বাবলু পাথর।

দিদি!

নোটন দৌড়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। সুতপার শরীরে শাড়ির চিহ্নমাত্র নেই। ব্লাউজ ছেঁড়া। নোংরা কাদায় চোখ মুখ এমন মাখামাখি যে অন্য কেউ দেখলে চিনতে পারত না।

—অ্যাই দিদি? কী হয়েছে তোর? অ্যাই দিদি?

সুতপা বার কয়েক চোখ খুলে তাকানোর চেষ্টা করল। হাত বাড়িয়ে বলতেও চাইল কিছু। কিছুই বোঝা গেল না। গলা দিয়ে উদ্ভট গোঁ গোঁ শব্দ বার হল মাত্র। ঠোঁট, গাল, কপাল, চিবুক সব একসঙ্গে কেঁপে উঠল থরথর করে। জল থেকে তোলা মাছের মতো কাদায় আছাড় খেল দু-তিন বার। তারপর বাবলুর হাতের ওপরই অজ্ঞান হয়ে গেল।

বাবলু দুহাতে মুখ ঢেকে ফেলল।

ডিউটি অফিসার খাতায় খসখস করে কিছু লিখে চলেছে। শেষ করে আবার প্রশ্ন করল,

—কী দেখলে বলো?

বাবলু ঢোক গিলল। বলতে গিয়ে স্বর দুলে গেল ভীষণভাবে,

দিদি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

—বাড়িটার ভেতরে? না বাইরে?

—বাইরে।

আবার কিছু লিখল ভদ্রলোক। মেডিকেল রিপোর্টে নতুন করে চোখ বোলাল,

—তোমার দিদিকে কি প্রায়ই খুঁজতে বেরোতে হয়?

—না। আজ বৃষ্টির জন্য দিদির দেরি হচ্ছিল।

—রোজই তোমার দিদি সন্ধ্যের পর বাইরে থাকে? এরকম?

—দিদি পড়াতে যায়।

—আজ পড়াতে গিয়েছিল কিনা তুমি সিওর?

বাবলুর গলা শক্ত হল এবার, হ্যাঁ। আমার দিদি রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোর মেয়ে নয়।

ডিউটি অফিসারের ঠোঁটে এক ফালি বাঁকা হাসি দেখা দিল। বাবলুর দু'হাত নিজের অজান্তে মুঠো হয়ে গেছে। লোকটা অকারণে উল্টোপাল্টা জেরা করে চলেছে। কঠিন একটা উত্তর এসে গিয়েছিল মুখে, অনুতোষ কাকা তার আগেই উত্তেজিত ভাবে বলে উঠেছেন,

—শী হ্যাজ বিন রেপড্ স্যার। ব্রুটালি।

—জানি। আপনাদের সকলকে আলাদা আলাদা স্টেটমেন্ট দিতে হবে।

দুহাতে মুখ ঢেকে বসে আছেন প্রিয়ব্রত। এখনও মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছেন।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত মানুষটা। কটা বাজে এখন?

অনুতোষ ঘড়ি দেখলেন। মাথার সামনে বড় দেওয়ালে ঘড়িতে দুটো দশ। হাসপাতাল থেকে এখানে এসে পৌঁছেছেন প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট। এত রাতেও কোথথেকে দুটো বছর পঁচিশের ছেলেকে ধরে নিয়ে এল মেজ দারোগা। গম্ভীর মেজাজে কনেস্টবলদের হুকুম দিল, পুরে রাখ ভেতরে। শালা। পাতা খাওয়া পার্টি সব। সকালে বাড়ির লোক এলে আমায় ডাকবি। আমি না আসা পর্যন্ত....

লোক দুটোর চেহারা সিড়িঙ্গে টাইপের। চোখ গর্তে ঢোকা। জুলজুল করে তাকাচ্ছিল চারদিকে। দৃষ্টিতে কোনও ভাষা নেই। প্যান্ট শার্ট মোটামুটি চকচকে। দামি। কারা এরা? কোথথেকে এল। এরা কি তাঁরই ছাত্র ছিল কোনওদিন? ইদানীং এসবের বহর খুব বেড়েছে এদিকে। বছর দশেক আগে বড় বড় দুটো কারখানা বসার পর থেকেই হু হু করে অবস্থার পরিবর্তন হয়ে চলেছে। নুতন নতুন বসতি গড়ে উঠছে। নতুন মুখ। বাজারে গেলে অনেককে চিনতে পারেন না অনুতোষ। সময় কী দ্রুত এগিয়ে যায়। গুন্ডা মস্তানদের সংখ্যাও বাড়ছে দিনে দিনে। ছিনতাই পার্টি। ওয়াগন ব্রেকার। গত বছর ইলেকশনের আগে চার পাঁচটা খুনই হয়ে গেল। রাজনীতির জমি দখল। কত ভদ্র ছেলে আস্তে আস্তে কোথায় নেমে গেছে। এই তো বিপিনবাবুর ছেলেটা...। অনুতোষের মাথায় চকিতে বিদ্যুৎ খেলে গেল। দু হাত্তা রোজগার করছে আজকাল। বাড়ির হাল ফিরে গেছে। গায়ে রঙ চড়েছে। পাশ দিয়ে গেলে সারা দিনরাত হিন্দি ফিল্মের শব্দ শোনা যায়। উদ্দাম। ছেলেটার এখন মস্তান হিসেবে রামনগরে খুব নাম ডাক। গোটা অঞ্চলের লোক মান্যিগণ্যি করে। ভয়ে। আতঙ্কে। ক্ষমতার দাপট দেখে। বিপিনবাবুও আর সে বিপিনবাবু নেই। যে লোকটা এককালে বিপ্লবী ছিলেন। সরকারের দেওয়া তাম্রপত্র ফিরিয়ে দিতে যাঁর হাত কাঁপেনি, সেই লোকটা কেমন কুঁজো হয়ে গেছেন। লাঠি ছাড়া হাঁটতে পারেন না। দেখা হলে কথাবার্তা বিশেষ বলতে চান না। এড়িয়ে যান। প্রিয়ব্রতর মেয়েটাকে বিপিনবাবুর ছেলে কাজলই কি...।

অনুতোষের মাথা গুলিয়ে যেতে শুরু করল। ডিউটি অফিসার আবার এক মনে কী লিখে যাচ্ছে। মেজ দারোগা ইউনিফর্ম ছেড়ে লুঙ্গি পরে এসে বসেছে নিজের চেয়ারে। গেঞ্জির ভেতর দিয়ে রুল চালিয়ে পিঠ চুলকোচ্ছে। ঘসে ঘসে। দরজার ঠিক গোড়ায় সেন্ট্রিটা ঝিমোচ্ছে টুলে বসে। থানাতেও রাত নেমেছে। কালবৈশাখী বয়ে যাওয়ার পরে ঠাণ্ডা রাত। ইলেকট্রিকের তার ছিঁড়ে যাওয়া অন্ধকার রাত।

লেখা শেষ করে ডিউটি অফিসার প্রিয়ব্রতর দিকে তাকাল। গলার স্বর আচমকা নরম করে ফেলেছে। প্রিয়ব্রতকে দেখে এতক্ষণ পর বুঝি মায়া এসেছে

মনে।

—এবারে যে স্যার আপনাকে একটু...

প্রিয়ব্রত যেন অনেক কষ্টে ঘাড় তুললেন। হাসপাতালে কান্নাকাটি করেছেন খুব। এখনও চোখ লাল।

—আপনার নাম?

—প্রিয়ব্রত বসু।

—বাবার নাম?

—স্বর্গীয় লালমোহন বসু।

—ঠিকানা?

—সুভাষ পল্লী।

—কী করেন আপনি?

—চাকরি। প্রাইভেট· কোম্পানিতে।

কটা নাগাদ আপনি খবর পান? কার কাছে?

প্রিয়ব্রত ঢোক গিললেন। কান্না চাপার চেষ্টা করছেন। ফ্যালফ্যাল করে নোটনের দিকে তাকালেন।

নোটন বলে উঠল,—আমরা তপুদিকে নিয়ে হাসপাতালে যাবার সময় ভানুকে খবর দিয়ে যাই। ভানুই মেসোমশাইকে নিয়ে হাসপাতালে....

—তুমি চুপ করো। ডিউটি অফিসারের গলা রূঢ় হল আবার,—যা বলার উনিই বলতে পারবেন। বলেই গলাটাকে পোষ মানিয়ে নিয়েছেন,

—আপনার মেয়ের কি কারুর সঙ্গে ভাবসাব ছিল? মানে কোনও অ্যাফেয়ার?

প্রিয়ব্রত দুদিকে মাথা নাড়লেন।

—আপনি সিওর?

এবাব বেশ অসহায় বোধ করলেন প্রিয়ব্রত। অনুতোষ তাঁর পিঠে হাত রাখলেন। মনে মনে বিরক্ত। এই মুহূর্তে মানুষটাকে এসব প্রশ্ন না কবলেই কি নয়!

—কাউকে সাসপেক্ট করেন আপনি?

প্রিয়ব্রত আবারও দুদিকে মাথা নাড়লেন। ধরা গলায় বললেন,—মেয়েটা জন্মেছে এখানে। বড় হয়েছে এখানে। সবার সঙ্গে চেনাজানা, মেলামেশা, কাকে সাসপেক্ট করব?

বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছেন। বাবলু সঙ্গে সঙ্গে তার দুকাঁধ চেপে ধরেছে।

বাইরে থেকে একটা কনস্টেবল এসে জানান দিল, —বড়বাবু আসছেন

কোয়ার্টার থেকে।

মুহূর্তে ডিউটি অফিসার সচকিত। মেজবাবুও নড়ে চড়ে বসেছে সামান্য। কালো প্যান্টের ওপর নীল বুশ শার্ট চড়িয়ে এসেছেন ভদ্রলোক। চোখ দেখে বোঝা যায় ঘুম থেকে ডেকে তোলা হয়েছে। ঘরে ঢুকে অনুতোষদের এক ঝলক দেখে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন। গিয়েই বেল বাজিয়েছেন। ডিউটি অফিসার উঠে গেলেন। মেজ দারোগার ডাকে পেছন ফিরলেন অনুতোষ।

—আপনি কে হন ওনার?

—পুরনো বন্ধু। প্রতিবেশী।

—আপনি আদর্শ বিদ্যাপীঠে পড়ান না?

অনুতোষ বেশ অবাক হলেন। পুলিশ দারোগারা বোধহয় সব খবর রাখে। প্রশ্ন করেই আড়মোড়া ভাঙল বড় করে,

—দেখুন আপনারই কোন ছাত্র...

কী ইঙ্গিত করতে চায় লোকটা? অনুতোষ বেশ আহত বোধ করলেন। এই তো ভানু, নোটন, বাবলু এরাও তাঁর ছাত্র। এদেরই মত কেউ...। ভাবতেও নিজের ওপর ঘৃণা আসে। দু আঙুলে কপাল টিপে ধরলেন।

ভানু নোটন আর বাবলু দেওয়ালের গায়ে রাখা খালি বেঞ্চিটাতে বসে পড়ল। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। শ্রান্তি আসছে অনুতোষেরও। কতক্ষণে এখান থেকে বেরোন যাবে কে জানে!

ডিউটি অফিসার ওসির ঘরের পর্দা সরিয়ে মুখ বাড়াল,—আসুন আপনারা। স্যার ডাকছেন ভেতরে।

ওসির টেবিলের পেছনে ব্ল্যাক বোর্ড টাঙানো একটা। চক দিয়ে ঘর কেটে বিভিন্ন রকম অপরাধের পরিসংখ্যান লেখা সেখানে। গোটা বছরের সালতামামি। টেবিলে কাচের নিচে মা কালী। ছবি ঘিরে অজস্র ভিজিটিং কার্ড। দেওয়ালে দামি বিদেশি ক্যালেন্ডার ঝুলছে। টেলিফোন রাখার বাক্সটার গায়ে এক দাড়িওলা সন্ন্যাসীর ছবি। কনস্টেবল ঢুকে আরও একটা হ্যারিকেন রেখে গেল।

প্রিয়ব্রতদের হাত দেখিয়ে চেয়ারে বসতে বললেন ভদ্রলোক।

—আপনার মেয়ের জ্ঞান ফিরেছে?

প্রিয়ব্রত এতক্ষণে অনেকটা সামলে নিয়েছেন নিজেকে। নীচুস্বরে উত্তর দিলেন,

—ঘুমের ইন্‌জেকশন দিয়েছে।

—ঠিক আছে। কাল আমি নিজে হাসপাতালে যাব। নিজে শব্দটার ওপরে জোর দিলেন ভদ্রলোক,—আপনার মেয়ের সঙ্গে কথা বলে আসব। নিশ্চিন্ত থাকুন।

অনুতোষ বলে উঠলেন,—বদমাইশগুলো ধরা না পড়া পর্যন্ত...

—কিছু ভাববেন না। ধরা পড়বেই। পালাবে কোথায়? বলতে বলতে উদাস হয়েছেন,—আসলে কী জানেন তো...চারদিকে এত ইন্ডাস্ট্রি ফিন্ডাস্ট্রি গজিয়ে উঠছে... আর এসব বদমাইসও বাড়ছে। এই তো ফেব্রুয়ারিতে যে কেসটা হয়ে গেল। মেয়েটার চালচলন অবশ্য খুব ভাল ছিল না...। প্রোভোকেটিভ। পোশাক আশাক যা পরত! সেই ছেলেগুলোকে তো চালান করে দিয়েছি।

প্রিয়ব্রত বলতে গেলেন,—আমার মেয়ে তো সেরকম...

ওসি থামিয়ে দিলেন, —না, না, আমি তা বলিনি। আপনারা স্টেটমেন্টগুলো সব সই করে বাড়ি চলে যান। কাল সকালে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

কাজ সেরে বেরোতে বেরোতে তিনটে বাজল। থানার সেন্ট্রি লম্বা বারান্দার ঘণ্টাটাকে বাজাল ঢং ঢং। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে আবার। বাবলু নর্দমার ধারে গিয়ে হুড়হুড় করে বমি করে ফেলল, নোটন ভানু দৌড়ে গিয়ে ধরল তাকে। সামনের টিউবওয়েলের কাছে নিয়ে গিয়ে ঘাড় মাথা ধুইয়ে দিল ভাল করে। প্রিয়ব্রতর বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। অনুতোষের হাত খামচে ধরলেন। আকস্মিক ভাবে স্ত্রীর মুখটা ভেসে উঠেছে চোখের সামনে। কোন মুখ নিয়ে গিয়ে দাঁড়াবেন এখন বাবলুর মা'র সামনে? এতদিনকার নিশ্চিন্ত সংসার...ছেলে ...মেয়ে। গোটা পৃথিবী দুলতে শুরু করেছে। মস্তিষ্কের অবশ ভাব কেটে এখন শুধুই তোলপাড়। হাঁটু দুটো ক্রমে আরও দুর্বল হয়ে গেল। ভেজা রাস্তার বুকে উবু হয়ে বসে পড়লেন প্রিয়ব্রত।

১লা মে বিকেল চারটে

বিকেলে হাসপাতালে এসে খবর পেলেন প্রিয়ব্রত ও শোভনা। ও সি কথা রেখেছেন। নিজেই এসেছিলেন সকালে।

দোতলায় এমারজেন্সি ওয়ার্ডের একেবারে শেষ বিছানায় পাশ ফিরে শুয়ে আছে সুতপা। জানলার দিকে মুখ। শোভনা প্রায় উদভ্রান্তের মত ছুটে গেলেন মেয়ের কাছে। কাল থেকেই মেয়েকে একবার চোখের দেখা দেখার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। সকালেও হাসপাতালে আসতে চেয়েছেন। বাবলু আসতে দেয়নি। প্রিয়ব্রতকেও না।

—তোমরা এখন আর গিয়ে কী করবে? ভিজিটিং আওয়ার ছাড়া কাছে গিয়ে বসতেও পারবে না। তাছাড়া আমি তো খোঁজ নিয়ে এলাম। দিদি অনেকটা ভাল আছে এখন।

মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে বাবলু যেন কত বড় হয়ে গেছে। ষোল বছরের কিশোর হঠাৎই এক রাতে প্রাপ্ত যুবক। সকাল থেকে সামাল দিচ্ছে সব দিক। বাড়িতেও লোক আসার বিরাম নেই। পাড়াপ্রতিবেশীরা সকলেই একবার করে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। যে কোনদিন বাড়িতে আসে না, সেও। সান্ত্বনা আর আফশোসের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে হাজার পরামর্শ। অযাচিত বুদ্ধি দান। অকারণ কৌতূহল।

—অমন সুন্দর মেয়েটার কত বড় সর্বনাশটা হয়ে গেল...

—আহা, কি হাসিখুশি ছিল মেয়েটা...। বিয়ের যুগ্যি মেয়ে..কি যে হবে এখন?

—ওকে ওরকম সন্ধেবেলা টিউশনি করতে যেতে দিতেন কেন দিদি? জানেনই তো কী দিন কাল...।

—হায় হায়। অত বুদ্ধিমতী হয়েও তপু এমন ভুলটা করল কী করে? ওইরকম অন্ধকারে জলঝড় মাথায় নিয়ে একা একা ফেরার সাহস করতে আছে?

—কজন মিলে কাজটা করেছে কিছু বোঝা গেল?

—এসব হল বেশি হিন্দি সিনেমা দেখার ফল। আজকাল তো ভায়োলেন্স, রেপ ছাড়া ফিল্মই হয় না।

—যা বলেছেন।

এখনও আরও আত্মীয়-স্বজনরা জানতে বাকি আছে। তারা এসে আরও কি বলে! সকলেরই কথার ভাবে মনে হয় দোষের ভাগী বুঝি সুতপাও কিছুটা। দোষ সন্ধেবেলা টিউশনি করতে যাওয়ার। দোষ একা একা বাড়ি ফেরার। দোষ হিন্দি সিনেমার। কেউ একবারও বলছে না একটা সভ্য দেশে কেন একটা সভ্য মেয়ের স্বাধীনভাবে চলা ফেরা করার অধিকার থাকবে না। মনে হয় এটাই যেন স্বাভাবিক নিয়ম। পুরুষের সমাজে পাশবিক হয়ে ওঠার অধিকার একমাত্র পুরুষেরই আছে। মেয়েরা তো শুধুই ভোগের জন্য। কলঙ্কিত হওয়ার জন্য। সিনেমা থিয়েটারের উত্তেজক দৃশ্য মানুষের প্রথম রিপুটাকে তাতিয়ে তুলতেই পারে। সেই কারণেই শুধু পশুর থেকেও পাশবিক হয়ে উঠতে পারে মানুষ?

না। কেউ চিন্তা করে দেখছে না সেভাবে। প্রিয়ব্রতও না। বাবলুও না। প্রিয়ব্রত শুধুই ভেতরে ভেতরে ভাঙছেন আরও। বাবলু ক্ষুব্ধ। আহত। একমাত্র শোভনাই লক্ষ প্রশ্নের ঝাপটায় বারবার আছাড় খেয়ে পড়ছেন। সেই কাল রাত থেকেই। প্রবল বন্যার তোড়ে ভেসে যাচ্ছেন অসহায়। প্রথমটা শোনার পর মাথা সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। শরীরের সমস্ত শক্তি যেন হারিয়ে ফেলেছিলেন। তপুকে নয়, কেউ যেন তাঁকেই পিষে থেঁতলে চলে গেল। এরপর মেয়ের বিয়ে দেবেন কী ভাবে? কোন ভবিষ্যত নিয়ে বাঁচবে মেয়েটা? কাল অনেক রাত পর্যন্ত

অনুতোষবাবুর স্ত্রী ছিলেন পাশে। অনুতোষবাবুর মেয়ে ঝর্ণাও। ঝর্ণা কাঁদছিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিল। শোভনা নিশ্চল বসে ছিলেন। কোন দোষে এত বড় শাস্তিটা পেল তপু? আর কি কোনওদিন স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবে? এ সময় মেয়েটার পাশে থাকতে পারলে ভাল হত। তপুর এখন মাকেই দরকার বেশি। যত ভেবেছেন উদভ্রান্ত হয়েছেন তত। ছটফট করে মরেছেন।

মেয়ের পায়ের দিকে খাটের রেলিঙ আঁকড়ে দাঁড়িয়ে আছেন প্রিয়ব্রত। শোভনা হাত রাখলেন মেয়ের গায়ে। মেয়ে কেঁপে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে। কেঁপেই স্থির।

লম্বা টানা ওয়ার্ডের সব কটা বিছানাতেই রুগি। নানান বয়সের। মাটিতেও তোষককম্বল পেতে শুইয়ে রাখা হয়েছে অনেককে। সকলের কাছেই বাড়ির লোক আসতে শুরু করেছে ধীরে ধীরে। ক্রমে ভিড় বাড়ছে। গুনগুন শব্দ ভাসছে গোটা হল ঘরটা জুড়ে।

শোভনা খুব আস্তে ডাকলেন,

—তপুউ...তপু...

সুতপা ফিরল না। জানলাব বাইরে যেটুকু আকাশ দেখা যাচ্ছে সেদিকে নিষ্পলক তাকিয়ে আছে। বোবা, বোধহীন দৃষ্টি। কাল রাতের পর থেকে একটুও কাঁদতে পারেননি শোভনা। এখন হঠাৎ দুচোখ ভিজে গেল। স্বামীর দিকে তাকালেন। কান্না চাপবার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন তিনিও। হু হু করে চোখ বেয়ে কিছু ঝাপসা ছবি ভেসে গেল...

. তীব্র যন্ত্রণায হাসপাতালে ছটফট করছেন শোভনা। প্রথম সন্তান আসছে। গর্ভ ছিঁড়ে। গোটা শরীর তোলপাড় করে। দুদিন তিন রাত ধরে সে কী অসহ্য যন্ত্রণা। একসময় বিছিন্ন হল শবীর থেকে। শালিখ ছানার মত এত্তটুকুন। লালচে বঙের। মাথায় শুঁয়ো শুঁয়ো চুল। আধফোটা চোখ। এত ছোট যে প্রিয়ব্রত কোলে নিতে ভয পেতেন। শোভনাও কি পারেন ভালভাবে সামলাতে! মাঝেমাঝেই ট্যাঁ ট্যাঁ করে কেঁদে উঠছে শালিখছানা। শোভনা কোলে তুলে দুধ খাওযাচ্ছেন। আনাড়ি মাযের মতো। মা হাঁ হাঁ করে উঠল দেখে,—ওভাবে নয় রে বোকা। ওভাবে চেপে ধরলে শ্বাস বন্ধ হয়ে মরে যাবে সে। দুই স্তন কটকট করে উঠল। অদ্ভুত এক অচেনা যন্ত্রণা। এক বুকে শিশুমুখ রাখলে অন্য বুক ভেসে যায় দুধে। দুধ? না রক্ত? রক্তই কি দুধ হয়ে বেরিয়ে আসে?

...দৃশ্য বদলে গেল। বাপের বাড়ির থেকে তিন মাসের মেয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন শোভনা। শালিখছানা প্রতিদিন একটু একটু করে বড় হচ্ছে। আধন্যাড়া মাথায় চুল গজালো। পাতলা পাতলা। নরম নরম। দেখতে দেখতে গোলগাল

ডলপুতুল একটা। শোভনা সারা দিন ব্যস্ত মেয়ে নিয়ে। ছেলেবেলার পুতুল খেলার দিনগুলো ফিরে এসেছে যেন। এবার খেলার সঙ্গী প্রিয়ব্রত। পালা করে রাত জেগেছেন দুজনে। কাঁথা পাল্টাচ্ছেন। দুধ খাওয়াচ্ছেন বোতলে করে। ক্রমশ বেড়ে উঠছে মেয়ে। এই বসা শিখল। এই হাঁটা। আধো আধো বুলি ঠোঁটে। ...দৃশ্যপট বদল আবার। মেয়ে প্রথম স্কুল যাচ্ছে বাবার হাত ধরে। তুলতুলে পাখির ছানা ডানা মেলে উড়তে শিখছে প্রথম। বাবা মা'র হাত ধরে এক চোখে খুশি চিকচিক। অন্য চোখে ভয়।...

সেই মেয়ে দেখতে দেখতে কবে যে এত বড় হয়ে গেল। চাঁদের কলার মত বাড়তে বাড়তে পরিপূর্ণ নারী কখন। স্কুল পাশ করে কলেজ গেল। বি এ পাশ করে মাস দুয়েক হল শর্টহ্যান্ড টাইপিংয়ে ভর্তি হয়েছিল। টিউশনিও ধরেছিল গোটা দুয়েক। প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে ভাইয়ের জন্য ঘড়ির ব্যান্ড কিনে এনেছিল। শোভনার জন্য এক শিশি পারফিউম। বাবার জন্য আফটার শেভ।

প্রিয়ব্রত হেসেছিলেন,—এসব কি আমার সহ্য হবে রে? এই বয়সে? ছাপোষা মানুষ। এসব কোনওদিন আমাকে ব্যবহার করতে দেখেছিস?

মেয়ে চোখ পাকিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে,—ছাপোষা মানুষদের বুঝি শখ-আহ্লাদ থাকতে নেই?

—তা নয়। কোনওদিন তো এসব মাখিটাখিনি। সেই আঠারো বছর বয়স থেকে দাড়ি কামানো ধরেছি। বাহান্নোয় পা দিলাম। এখনও সেই আদি অকৃত্রিম ফটকিরি। মাঝেমধ্যে শীতকালে একটু যা ক্রিমট্রিম লাগাই। তাও তোর মার পাল্লায় পড়ে। কেটে গেলে স্যাভলন। ডেটল।

—এবার থেকে অ্যাটোমাইজার লাগাবে। ফুরোলে আবার কিনে দেব।

শোভনা হেসেছিলেন চোখ টিপে,—ও। বাবার বেলাতে কিনে দেব। আর আমারটা যে নিজে কিনে নিজেই মেখে শেষ করছিস। তার বেলা?

—তুমি মাখো না কেন? মাখলেই পারো। শেষ হলে তোমারও আসবে। বলতে বলতে মাথা দোলাচ্ছে,—দাঁড়াও না। একটা চাকরি পেয়ে নিই, তখন দেখবে তোমাদের দুজনকেই....

—আর তোমাকে আমাদের দেখে কাজ নেই। এবার ভালয় ভালয় পার করতে পারলে বাঁচি।

—ওফ্। তোমাদের এখনও কী সব প্রিমিটিভ আইডিয়া। মেয়ে মানেই আগে বিয়ে। কোনরকমে ঘাড় থেকে নামিয়ে ফেলা।

এরকমই পাকাপাকা কথা চিরটাকাল। সেই ছোট্ট থেকেই। সারাদিন হৈচৈ

করে বেড়াচ্ছে। কারণে অকারণে হাসি খিলখিল। আর ভাইয়ের সঙ্গে খুনসুটি। প্রায়ই মারপিঠ। হাতাহাতি। পরক্ষণেই ভাব আবার। আর কি কোনওদিন হাসতে পারবে সেভাবে? বাবলুও কি...

শোভনা আলগোছে চোখের কোলে জমা বাষ্পটুকু মুছে নিলেন। মেয়ের গায়ের কাছে, বিছানায় উঠে বসলেন।

—শোন। মন খারাপ করিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

প্রিয়ব্রতও এগিয়ে এসে হাত রাখলেন মেয়ের মাথায়,

—ভয় পাস না। আমরা আছি তো।

বলতে বলতে স্বর কেঁপে গেছে। মেয়ের ব্যাপারে প্রিয়ব্রত চিরদিনই বড় দুর্বল। শোভনার থেকেও। শোভনা একবার স্বামীকে দেখে নিয়ে আবার মেয়ের দিকে ফিরলেন। দৃঢ় হল গলার স্বর,

—তুই ভয় পাবি কেন? লজ্জাই বা কিসের? অন্যায় তো তুই করিস নি। যারা করেছে...

সুতপা আচমকা ফিরে মুখ গুঁজে দিল মায়ের কোলে। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কান্নার দমকে গোটা শরীর ফুলে ফুলে উঠছে। শোভনা হাত বোলাচ্ছেন মেয়ের পিঠে। কাঁদুক। প্রাণভরে কেঁদে নিক। কান্নায় গ্লানি অনেক ধুয়ে যায়। প্রিয়ব্রত মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। জানলার বাইরে তাকিয়ে সামলাচ্ছেন নিজেকে।

পাশের বেডের মহিলাটি তখনই খবরটা দিলেন। খাটের পিঠে হেলান দিয়ে আপেল চিবোতে চিবোতে বলে উঠলেন,

—আজ বেলায় পুলিশ এসেছিল। সব জেনে নিয়ে গেছে।

প্রিয়ব্রত চমকে তাকালেন, —এসেছিল?

—হ্যাঁ। অনেকক্ষণ ধরে কথা বলল আপনার মেয়েব সঙ্গে।

প্রিয়ব্রতর মুখ থেকে আপনাআপনি বেরিয়ে এল, —কী বলল?

—তা অত বলতে পারব না। পর্দা টেনে দিয়ে কথা বলছিল। নার্স বলল, বড় দারোগা।

পর্দা যদি এখনও টেনে দেওয়া যেত। অনেকেই ঘুরে ঘুরে দেখছে এদিকে। দুএকজন তো অসভ্যর মতো একেবারে সামনে এসে হাঁ করে দেখে যাচ্ছে। যেন কোনও বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছু। যে মহিলাটি কথা বলছেন তাঁরও বলার ভঙ্গি খুব শোভন নয়। তাঁর পাশে টুলে বসা রোগা মতন যুবকটি প্রশ্ন করে উঠল,

—পুরো রেপ করেছে? না ট্রাই নিয়েছিল?

মহিলা চটপট উত্তর করলেন,—না। না। পুরোই। কাল রাত্তিরে কী অবস্থায় না এসেছিল...রাতভর কী কাঁপুনি...গ্যাঁজলা বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে।

মেয়েরও নিশ্চয়ই কানে যাচ্ছে কথাগুলো। কান্না থেমে গেছে। শোভনা টের পেলেন শরীর ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠছে মেয়ের। ওর সামনে এসব কথা কি জোরে জোরে না বললেই নয়? এতটুকু জ্ঞানগম্যি থাকবে না মানুষের? নাকি এও এক ধরনের নিষ্ঠুরতা। যা মানুষই করতে পারে।

বিরক্ত মুখে স্বামীর দিকে তাকালেন শোভনা। চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন,

—তপুকে এখন বাড়ি নিয়ে যাওয়া যায় না?

প্রিয়ব্রতও বিরক্ত হয়েছেন। অন্যের ব্যাপারে মানুষ কেন যে এত কৌতূহল দেখায়! একজনের যন্ত্রণা আরেকজনের কাছে মুখরোচক খোরাক হয়ে ওঠে! দুটি মেয়ে এগিয়ে এসে এবার উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে সুতপাকে। মেয়েকে আড়াল করে দাঁড়ালেন,

—ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে দেখি একবার। একটা কেবিনের ব্যবস্থা যদি করা যায়...

—না। তুমি বন্ড সই করে দাও। ওকে আমি নিয়ে যাব। আজই।

শোভনা দুহাতে মেয়েকে বুকের কাছে টেনে নিলেন। আরও ভাল করে। পারলে আঁচল দিয়ে ঢেকে দেন।

প্রিয়ব্রত যেতে গিয়েও ফিরে দাঁড়ালেন। ওসির কাছে তপু কি নাম বলতে পেরেছে শয়তানগুলোর? অ্যারেস্ট হয়েছে তারা? ডাক্তার নার্সরা কি কিছু বলতে পারবে? শোভনাকে বাড়ি পৌঁছে থানায় যেতে হবে একবার। তাঁর মেয়ের এমন অবস্থা যারা করেছে তাদের তিনি কিছুতেই ছাড়বেন না।

সুতপার শরীর এখনও শক্ত হয়ে আছে। শোভনা মেয়ের মুখের কাছে কান নিয়ে গেলেন,

—কারুর কথায় কান দিস না তপু। মনে সাহস আন। ভেঙে পড়লে পাঁচজনে আরও পেয়ে বসবে। মজা করবে তোকে নিয়ে।

সুতপা দুহাতে শোভনার কোমর আঁকড়ে ধরল।

শোভনা গলা আরও নীচু করলেন,

—চিনতে পেরেছিলি তাদের? ভয় পাস না। বল আমাকে। চিনিস?

মেয়ে অনেকক্ষণ পর মুখ তুলল কোল থেকে। বিছানায় টানটান হয়ে শুল। শোভনা শিউরে উঠলেন। মেয়ের দু'গালে চাকাচাকা দাগ দাঁতের। হিংস্র নখের। ওপরের ঠোঁট ভীষণভাবে ফুলে উঠে ঢেকে দিয়েছে নীচের ঠোঁটকে। চোখের তলায় ঘন কালসিটে। আরও কত দাগ পড়েছে এরকম? কোনওদিন উঠবে এ দাগ মেয়ের শরীর থেকে? বুকের মধ্যে জমে থাকা গুমোট ভাব ঝড় হয়ে উঠতে চাইছে। তবু সংযত থাকতেই হবে। চাদর টেনে ভালভাবে ঢেকে দিলেন মেয়ের

শরীর। মেয়ে চোখ বুজে রয়েছে। দুগাল বেয়ে নিঃশব্দে গড়িয়ে যাচ্ছে জলের ধারা। কানের পাশ বেয়ে টপটপ গড়িয়ে গেল বালিশে। নীচে একটা সাইরেনের মতো শব্দ শোনা গেল। কোনও অ্যাম্বুলেন্স ঢুকল বোধহয়।

শোভনা দুহাতে মুখ ঢেকে ফেললেন। মেয়েকে আর একটা কথাও জিজ্ঞাসা করতে পারলেন না।

১লা মে মধ্যরাত

কাল রাত থেকে দুচোখের পাতা এক হয়নি একবারও। আজও ঘুম আসবে না। পাশে জেগে আছে শোভনাও। থেকে থেকে স্ত্রীর দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন প্রিয়ব্রত। এ নিশ্বাস ঘুমের নয়। প্রিয়ব্রত বুঝতে পারছেন। সন্ধেবেলা হাসপাতাল থেকে ফেরার পর কারুর সঙ্গে একটা কথা বলেননি শোভনা। কাল সকালে মেয়েকে বন্ড সই করে না নিয়ে আসা পর্যন্ত বলবেনও না। প্রিয়ব্রত জানেন। ফিরে এসে জল পর্যন্ত খাননি। ঘর অন্ধকার করে শুয়ে পড়েছেন। প্রিয়ব্রতর বুকটা টনটন করে উঠল। তপুকে তিনি কি কম ভালবাসেন? শোভনার থেকে কি কম আঘাত পেয়েছেন তিনি?

সন্ধেবেলা শোভনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে একা একাই গিয়েছিলেন থানায়। থানার চেহারা তখন একেবারে অন্যরকম। বিকেলের মুখে কারেন্ট এসে গেছে। কাল রাতের ঘরখানায় হাই পাওয়ারের আলো জ্বলছে গোটা দুয়েক। লো ভোল্টেজের জন্য মাঝে মাঝে ম্রিয়মাণ হয়েও উজ্জ্বল হচ্ছে দপ করে। ঘটাং ঘটাং শব্দ করে মাথার ওপর ঘুরে চলেছে আদ্যিকালের দুটো ঢাউস ফ্যান। দেওয়ালে ঝোলানো আর টি বক্স থেকে ভৌতিক স্বর বেজে চলেছে একটানা। জড়ানো স্বরে। কান পেতে থাকলেও এক বর্ণ বোঝা যায় না। ঘরের কেউ শুনছেও না সেভাবে। মেজ দারোগা আর ডিউটি অফিসারটি ছাড়া আরও দুজন অ্যাসিসট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর কালকের ফাঁকা টেবিল চেয়ারে। বেঞ্চিটাও পরিপূর্ণ। এক মহিলা আর জনা তিনেক পুরুষ উবু হয়ে বসে আছে মাটিতে। বোধহয় ফ্যাক্টরির লেবার টেবার। প্রিয়ব্রত ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েই শুনতে পেলেন মেজ দারোগা তাদের উদ্দেশে বলে উঠল,

—বডি কী করে পাবি এখন? মর্গে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

গরিব মতন বউটি কেঁদে উঠল হাউ হাউ করে। একটা লোক টেবিলের তলা দিয়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল দারোগার পায়ের ওপর। দারোগা নির্বিকার,

—পায়ে পড়ে কী হবে? বললাম তো কাল পাবি। এখন বাড়ি যা। বলতে

বলতে দাঁতের ফাঁকে নখ ঢোকাল। খাবারের কুচি বার করে ফেলল থু থু করে,

—যা। যাহ্। আর জ্বালাস না এখন।

একটা মানুষের মৃত্যু, একটা মানুষের লাশ কত সহজ ঘটনা পুলিশ ডাক্তারদের কাছে। ডাক্তারদের থেকেও পুলিশরা বোধহয় এসব ব্যাপারে বেশি উদাসীন। বেশি নির্মম। সবসময় দেখে দেখেই হয়ত। প্রিয়ব্রত থমকে দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক সেকেন্ড। বেঞ্চিতে মাথায় পট্টি বেঁধে বসে বাবলুরই বয়সী একটা ছেলে। তাকে চেপে ধরে রয়েছে দুজন। ডিউটি অফিসারটির সামনে বসে আরও দুজন রিপোর্ট লেখাচ্ছে। লিখতে লিখতে কাল রাতের ছোকরা অফিসারটি চোখ তুলে একবার দেখল প্রিয়ব্রতকে। চিনতে পারল না যেন। প্রিয়ব্রত তার টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন,

—আমি কাল রাতে এসেছিলাম।

—হুঁ। বলুন।

—ওসি নেই শুনলাম। বেরিয়ে গেছেন। আমি একটু আপনার সঙ্গে...

—আপনার কেসটা বড়বাবু টেকআপ করেছেন। ওনার সঙ্গে কথা বলবেন।

—কখন ফিরবেন উনি?

—বলতে পারছি না। রাত হতে পারে। এস-পিকে মিট করতে গেছেন।

প্রিয়ব্রত তবু একটু ইতস্তত করলেন। বসবেন একটু? যদি এসে যান? কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বাইরের করিডোরে এলেন। দুজন কন্সটেবল বাইরে বেঞ্চিতে বসে খৈনি টিপছে। প্রিয়ব্রতকে দেখে জিজ্ঞাসা করল,

—আপনার সেই রেপ কেস তো?

প্রিয়ব্রত অন্যমনস্ক ভাবে মাথা নেড়ে ফেললেন। পৃথিবীসুদ্ধ লোক বোধহয় এতক্ষণে জেনে গেছে প্রিয়ব্রত বসুর মেয়ে ধর্ষিত হয়েছে। বাড়ির দিকে আসার সময় নতুন বাজারের সেই ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। প্রিয়ব্রতর সঙ্গে একসঙ্গে ট্রেনে অফিস যান। আলাপপরিচয় আছে। ঘনিষ্ঠতা নেই তেমন। ভদ্রলোক নিজেই এগিয়ে এলেন,

—কি দাদা? এদিকে কোথায় গিয়েছিলেন?

প্রিয়ব্রত ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝে নিতে চাইলেন ইনিও কিছু জানেন কি না।

—এই একটা কাজে...।

—অফিস যাননি আজ?

—না। প্রিয়ব্রত নিশ্চিন্ত মনে হাসলেন সামান্য। অনেকক্ষণ পর। তখনই ভদ্রলোক দুম করে প্রশ্ন করেছেন, —আপনি সুভাষ পল্লীতে থাকেন না? কাল

রাত্রে ও পাড়ার একটা মেয়ে নাকি রেপড হয়েছে? চেনেন নাকি?

প্রিয়ব্রত ঢোক গিললেন। মুখ পলকে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটছে কেউ। কোনরকমে মাথা দোলালেন, —হ্যাঁ...

—কালপ্রিটরা ধরা পড়েছে কেউ?

—না। প্রিয়ব্রত আমতা আমতা করে বলে ফেললেন,—পড়বে। ধরা পড়তেই হবে।

মশারির মধ্যে ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে গেলেন প্রিয়ব্রত। আকাশে এক ফোঁটাও মেঘ নেই আজ। তবু এত গরম। মধ্য বৈশাখ উত্তাপ ছড়িয়ে রেখেছে চারদিকে। টিকিস টিকিস করে ফ্যান চলছে। ফ্যানের হাওয়া গায়ে লাগছে না। ঘাড় ঘুরিয়ে অন্ধকারে শোভনাকে দেখার চেষ্টা করলেন। জানলা দিয়ে যেটুকু আলো আসছে তাতে ঘর জুড়ে ঠিক অন্ধকার নয়, আবছায়া। মশারি তুলে নেমে পড়লেন। জল খাবেন। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। মশারির চালে রাখা বেড সুইচ টিপতে গিয়েও টিপলেন না। থাক। শোভনার অসুবিধে হবে। ডাইনিং স্পেসে এলেন। ডাইনিং স্পেস বলতে সরু লম্বাটে খাওয়া দাওয়া করার জায়গা এক ফালি। ওপাশে তাঁদের ঘরের মুখোমুখি বাইরের ঘর। তার পাশের ঘরটা বাবলু সুতপার। এ পাশে রান্নাঘর। বাথরুম। সাড়ে আটশো স্কোয়ার ফুটের এই বাড়িটুকু তুলতে দেনা হয়ে গেছে অনেক। অফিস থেকে প্রতিমাসে লোনের জন্য বেশ মোটা টাকা কাটা যায়। তাও এখনও বাইরেটা প্লাস্টার করতে পারেননি। আগের বর্ষাতে প্রায় সব কটা ঘরে জায়গায় জায়গায় ড্যাম্প ধরেছে।

শোভনা বলেন,—থাক যেমন আছে। তপুর বিয়েটা আগে হয়ে যাক। তারপর দেখা যাবে। এখন কিচ্ছুতে আর হাত দিতে হবে না।

মেয়ের বিয়ের জন্য বছর দুয়েক ধরেই তাগাদা লাগাচ্ছেন শোভনা। প্রিয়ব্রত খুব একটা গা করেননি কোনওদিনই। খালি মনে হয় আর কটা দিন যাক। মেয়ে শ্বশুড়বাড়ি চলে গেলে বাড়িটা ফাঁকা হয়ে যাবে যে। তাছাড়া টাকা পয়সাও তো দরকার। আর টাকা পয়সা! মেয়েটাব কোনওদিন বিয়ে হবেই কি না কে জানে। উদার মানুষ কটা আছে পৃথিবীতে? প্রিয়ব্রত ডাইনিং টেবিল থেকে জগ তুলে অনেকটা জল খেয়ে নিলেন ঢক ঢক করে। বাইরে দু তিনটে কুকুর একসঙ্গে ডেকে উঠল। খসখস শব্দ হল কিসের। দরজায় আলগাভাবে টোকা দিল কেউ। ডাইনিং স্পেসের দরজায় নয়। বাইরের ঘরের দরজায়। আবার শব্দ হল। এবার বেশ জোরে। কে এল এত রাতে? তপুর কি বাড়াবাড়ি কিছু হয়ে গেছে? হাসপাতাল থেকে খবর এল? সুখেন্দুবাবু ফোন নম্বর দিয়ে এসেছেন হাসপাতালে। সুখেন্দুবাবুদের বাড়ি থেকে কি কেউ...! নাকি...! অজানা আশঙ্কায় প্রিয়ব্রতর বুক

ধড়ফড় করে উঠল।

—কে? কেএএ?

আরও জোরে ধাক্কা পড়ল। শোভনা উঠে এসেছেন বিছানা ছেড়ে। বাবলুও ধড়ফড় করে বেরিয়ে এসে বড় আলো জ্বালিয়ে দিল। দৌড়ে যাচ্ছে দরজা খুলতে। প্রিয়ব্রত প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, —দাঁড়া। তুই খুলিস না। আমি যাচ্ছি।

দরজার ওপাশে যে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে প্রথমটা চিনতে পারেননি প্রিয়ব্রত।

বাবলু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করছে—একি কাজলদা! তুমি? এখন?

কাজল ঘরে ঢুকে নিজেই দরজা বন্ধ করে দিল। দুচোখ নেশায় টকটকে লাল হয়ে আছে। বেতের চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ল ধপ করে। প্রিয়ব্রত অবাক হয়ে গেছেন। বাবলুও হতবাক। শোভনা স্থির দাঁড়িয়ে আছেন এপাশের দরজা ধরে।

প্রিয়ব্রত কথা বললেন বেশ কয়েক সেকেণ্ড পর,

—কি ব্যাপার কাজল? কিছু বলবে?

কাজল খরখরে চোখে তাকাল। প্রিয়ব্রতর দিক থেকে চোখ বাবলুর দিকে। বাবলুকে দেখে নিয়ে শোভনাকে দেখল।

—শুনুন। স্ট্রেটকাট কথা বলে নেওয়া ভাল।

—কী কথা বাবা?

কাজলের উদ্ধত ভঙ্গি দেখে ভয় পেলেন প্রিয়ব্রত। স্বাভাবিকভাবেই চোখ বাবলুর দিকে পড়েছে। বাবলু হাঁ করে তাকিয়ে আছে। শোভনা এগিয়ে এলেন,

—কী বলতে চাইছ?

—ন্যাকা সাজছেন কেন? জানেন না কিছু? কাজল আচমকা ধমকে উঠল—শোনেন নি মেয়ের কাছে? মেয়ে তো সবার নামই বলে দিয়েছে।

শোভনা, প্রিয়ব্রত দুজনেই প্রায় একসঙ্গে আঁতকে উঠেছেন,

—তুমি!

—হ্যাঁ। আমি। আমি। বলতে বলতে হঠাৎই গলা নামিয়ে ফেলেছে,—মদ খেয়েছিলাম। মেজাজটা খারাপ ছিল। হঠাৎই হয়ে গেছে। যা কমপেনসেশন চান দিতে রাজি আছি।

বাবলু দুম করে তেড়ে গিয়ে সজোরে গলা চেপে ধরেছে কাজলের। চকিত উত্তেজনায় হাপরের মত হাঁপাচ্ছে।

—তুমি! তুমিই!....

কাজল অতি সহজেই ধাক্কা মেরে ছিটকে দিল বাবলুকে। চৌকির পাশে আছড়ে পড়ল বাবলু। পায়ায় লেগে কপালের কোণা কেটে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। শোভনা

দৌড়ে গেছেন,

—মারছ কেন ওকে?

—মারিনি তো। তবে দরকার হলে....কাজলের গলা মুহূর্তে শীতল। বরফের মতো, জানেনই তো আমি খুব খারাপ ছেলে।

—তুমি আমাদের ভয় দেখাতে এসেছ?

—না ভরসা দিতে এসেছি। নিজেদের ভাল চান, ছেলে মেয়ের ভাল চান তো কোনও তিকড়মবাজি নয়। কাল থানায় গিয়ে রিপোর্ট উইথড্র করে আসবেন।

—ওভাবে রিপোর্ট উইথড্র হয় না। পুলিশ ইনভেস্টিগেশন আছে...মেডিকেল রিপোর্ট...

—কিসুই থাকবে না। মেয়েকে বলবেন অন্ধকারে কাউকে চিনতে পারেনি। বাকিটা আমি দেখব।

ঠাণ্ডা মাথায় ছেলেটা ঘরে ঢুকে ভয় দেখিয়ে যাচ্ছে। প্রিয়ব্রতর ইচ্ছে হল চিৎকার করে পাড়ার লোকজনকে ডাকেন। দরজার দিকে এগিয়েও ছিলেন, কাজল তার আগে উঠে দাঁড়িয়েছে।

—লাভ হবে না মেসোমশাই। বাইরে আমার লোকজন আছে। আমাদের দেখলে কেউ আসবে। থানায় তো সন্ধেবেলাও গিয়েছিলেন। সুবিধে হয়েছে?

শোভনা চিৎকার করে উঠলেন,—গুণ্ডা। বদমাইশ। শয়তান।

—চিৎকার করবেন না মাসিমা, যা বলার আস্তে বলুন।

—তুমি আমাকে মাসিমা বলে ডাকবে না। খবরদার।

প্রিয়ব্রত হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন, —কেন তুমি আমাদের এই সর্বনাশ করলে? কী অপরাধ করেছি? তপু কী ক্ষতি করেছিল তোমার?

—আহ! কাঁদবেন না। কাজলের ভুরু কুঁচকে গেল,—কান্নাকাটি করার কিছু হয়নি। অ্যাক্সিডেন্ট ইজ অ্যাক্সিডেন্ট। মেয়েকে কোথাও নিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। খরচাপাতির জন্য ভাবতে হবে না। শুধু একটা কথাই মেয়েকে শিখিয়ে দেবেন ভাল করে। কাল রাত্রে সে তিনজনের একজনকেও চিনতে পারেনি।

শোভনা দৃঢ়ভাবে বলে উঠলেন,—না। ও কথা আমরা কখখনো বলতে পারব না তপুকে।

—সেটা আপনাদের ব্যাপার। কাজল কথা বাড়াল না। ধীর পায়ে হেঁটে বাবলুর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বাবলুর জ্বলন্ত চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল ঠোঁট চেপে। বাইরের ঘরের চারদিকে চোখ বোলালো আলতো করে। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বলল,

—জানি অনেক কষ্ট করে বাড়িটা তৈরি করেছেন। যদি একেবারেই চলে যেতে চান আলাদা কথা। তবে মনে রাখবেন, আমাকে যদি ফেঁসে যেতে হয়...রামনগর ছাড়ার আগে আপনাদেরও ছেলেমেয়েকে এখানকার শ্মশানে রেখে যেতে হবে। সব উড়িয়ে দেব।

বলেই সশব্দে দরজা খুলে কাজল বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

২রা মে ভোর সাড়ে চারটে

দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন প্রিয়ব্রত। পাড়া প্রতিবেশীরা কেউ এখনও জাগেনি। গোটা পাড়া ভোরের নরম হাওয়ায় ঘুমিয়ে আছে আরাম করে। দিনের প্রথম স্নিগ্ধতায় পৃথিবী ভারী শান্ত, ঠাণ্ডা নরম বাতাস বইছে মৃদু, তবু হাঁটতে বড় কষ্ট হচ্ছিল প্রিয়ব্রতর। আরও একটু এগিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। এত সকালে কারা যেন বেরিয়ে পড়েছে। অনুতোষ নাকি? সঙ্গে কে? পাশের গলির চ্যাটার্জিবাবু না! মর্নিংওয়াকে এত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েন এঁরা? প্রিয়ব্রত মোড়ের কৃষ্ণচূড়া গাছটার আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন। ওঁরা আরও কাছে আসতে নিশ্চিন্ত। না। অনুতোষ বা চ্যাটার্জিবাবু নয়। দুজনেরই মুখ চেনেন প্রিয়ব্রত। বিশেষ আলাপ পরিচয় নেই। তবু দাঁড়িয়ে রইলেন। মানুষ দুজন বাঁদিকে ঘুরে যাওয়ার পর দ্রুত পা চালালেন। যত শীঘ্র সম্ভব হাসপাতালে পৌঁছতে হবে। সকালেই বন্ড দিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসবেন মেয়েকে।

বড় রাস্তায় পড়ার আগে ডানদিকে বিপিনবাবুর বাড়ি। হলুদের ওপর মেরুন বর্ডার দেওয়া। দোতলা বাড়িটা পার হওয়ার সময় প্রিয়ব্রতর বুক হিম হয়ে গেল। বিপিনবাবুর খোলা জানালাগুলোর গায়ে দামি রঙিন পর্দা বাতাসে পতপত দুলছে। দুলছে না, যেন হাসছে হি হি করে। হলুদরঙ বাড়িটা কাজল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এক দমে শনি মন্দিরের সামনে পৌঁছে গেলেন। নিজেকে খুব অসহায় মনে হল। নিজের ওপর ঘৃণা আসছে। কী করলেন সারা জীবনভর? আজীবন পরিশ্রম করেও নিশ্চিন্ততা দিতে পারলেন স্ত্রীকে? ছেলেকে? মেয়েকে? ওভাবে হয় না। অন্তত আজকের দুনিয়াতে।

বুড়োশিবতলার দিক থেকে একটা খালি সাইকেল রিক্সা আসছে। দিনের প্রথম রিক্সা চলতে শুরু করল বোধহয়। প্রিয়ব্রত হাত বাড়িয়ে ডাকলেন,—দাঁড়াও ভাই, হাসপাতালে যাব।

রিক্সায় বসে পেছন ফিরে তাকালেন। না, হলুদ বাড়ি আর দেখতে পাচ্ছে না তাঁকে। আধা তৈরি ফ্ল্যাট বাড়িটা পার হওয়ার সময় চোখ বুজে রইলেন।

কাল থেকে ওই বাড়িটাও গিলে খেতে চাইছে যেন। কঙ্কাল শরীর নিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে আসছে। দ্যাখো, দ্যাখো। আমাকে দেখে যাও। বর্তমান সভ্যতার ছোট্ট একটা প্রতীক আমি। স্কাই স্ক্র্যাপারের ছোট ভাই। সর্বত্রই আমি এখন। শহরে, মফস্বলে। আমারই খাঁচার মধ্যে তোমার একমাত্র মেয়ে...তোমার আদরের মেয়ে...ওফ। প্রিয়ব্রত এখন কী যে করেন। বাইশ বছর আগে এখানে এসে যখন বাসা ভাড়া করেছিলেন তখনও কী জনহীন ছিল অঞ্চলটা। স্টেশনের ওপারে, নতুন পল্লীর দিক থেকে রাতে শেয়াল ডাকত। চারদিকে ঘন গাছপালা। সব বাড়িতেই প্রায় একটা করে ছোট পুকুর। প্রিয়ব্রতরা থাকতেন প্রথমে চৌধুরীবাগানে। সেখান থেকে উঠে অনুতোষবাবুর বাড়িতে। সুতপা তখন বেশ ছোট। মা'ও বেঁচে। শ্যামবাজারের ঘিঞ্জি থেকে খোলামেলা জায়গায় উঠে আসতে পেরে খুব খুশি হয়েছিলেন মা। শোভনার অবশ্য মন বসত না প্রথম প্রথম। হাতিবাগানের মেয়ে, বেশি নির্জনতা পছন্দ না হওয়ারই কথা। পরে শোভনাই জায়গাটাকে ভালবেসে ফেললেন সব থেকে বেশি। অনুতোষবাবুদের সঙ্গে একত্রে বসবাস থেকে বন্ধুত্ব। পাশেই দু কাঠা জমি জলের দরে বিক্রি হয়ে যাচ্ছিল। অনুতোষবাবু বুদ্ধি দিলেন,

—কিনে রাখুন। এরপর আর এদিকের জমিতে হাত দিতে পারবেন না।

প্রিয়ব্রত ইতস্তত করেছিলেন। টাকা কোথায়? শোভনাই উদ্যোগ নিয়ে সমস্যার সমাধান করলেন। কিছু ধার আর শোভনার গয়না বেচে প্রায় দশ বছর আগে কেনা জমি। বাড়ি তুলেছেন বছর আড়াই। দেখতে দেখতে সত্যিই হু হু করে বেড়ে গেল জমির দর। এদিকে এখন তিরিশ চল্লিশ হাজার করে কাঠা। স্টেশনের কাছে, নতুন বাজারের দিকে আরও বেশি। লোহা, ইট, কাঠ, চুণ সুরকিও দ্যাখ-না-দ্যাখ গরম হয়ে গেল। অনুতোষবাবু দূরদর্শী মানুষ। তাঁর পরামর্শেই না...।

প্রিয়ব্রত পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরানোর চেষ্টা করলেন। হাওয়ায় বারবার নিবে যাচ্ছে। রিক্সাওলাটা গাড়ি চালাচ্ছে বেশ ধীরে ধীরে। বুড়ো মানুষ। বোধহয় বুড়োশিবতলার ওদিকেই থাকে। পাশ দিয়ে ঝড়ের বেগে একটা বাস বেরিয়ে গেল। এদিকে এখন অনেকগুলো বাসরুট হয়ে গেছে। প্রিয়ব্রত ট্রেনেই অফিস যান। সুবিধা হয়। এখান থেকে শেয়ালদা পঁয়ত্রিশ মিনিট। সেখান থেকে হেঁটেই এসপ্লানেড। কাল অফিস যেতে পারেননি। অফিসে একটা খবর পাঠানো দরকার। তপুকে বাড়িতে রেখে, সময় পেলে, স্টেশন পল্লীর অজয় দাসকে একটু বলে আসতে হবে। অফিসে যেন খবর দিয়ে দেয়। ভাবতে গিয়ে ফের অস্বস্তি। পরশু রাতের কেচ্ছাকাহিনী গোটা রামনগর জেনে গেছে। অজয় দাসও হয়ত...।

অফিসেও কি পৌঁছে গেছে সংবাদ? ডেভিড ফ্রেইট অ্যান্ড চ্যার্টার্সে-এ দীর্ঘ উনত্রিশ বছর ধরে চাকরি করছেন। বড় সাহেব থেকে বেয়ারা পর্যন্ত সকলের কাছে একটা আলাদা জায়গা আছে তাঁর। অ্যাকাউন্টস্ অফিসার। চারশো পঁচিশ টাকা থেকে মাইনে বেড়ে পৌনে দশ হাজার, তার থেকে বাদ যায় পাঁচশো মতন। তাই দিয়ে ছেলেমেয়ের পড়াশোনা, সংসার চালানো, নিজস্ব হাত খরচ। দিনদিন বাজার আগুন হয়ে উঠছে। কংগ্রেস সরকার গিয়ে বিজেপি সরকার কেন্দ্রে। কিছুদিন আগেই ইলেকশন গেছে। আশা ছিল নতুন গর্ভমেন্ট এসে কিছু একটা করবে। আশায় ছাই। প্রায় দু'যুগ গদিতে থেকে বামফ্রন্টই বা কী করল পশ্চিম-বঙ্গের? টপাটপ কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এখানে, ওখানে। আধা সরকারি সংস্থাগুলির অবস্থা বেহাল। দুর্নীতিতে দশ দিক ছেয়ে গেছে। রাজনীতি স্বার্থকেন্দ্রিক। হিংস্রতা আর দম্ভের নামান্তর। নইলে কাজলের মত ছেলেরা...

ভাবনায় ছেদ পড়ল। নীরবে রিক্সা চালাতে চালাতে বুড়ো লোকটা কথা বলে উঠেছে হঠাৎ। প্রিয়ব্রত চমকে উঠলেন,

—বাবু আপনার মেয়ে কেমন আছে?

প্রিয়ব্রত প্রথমটা কোনও উত্তর করলেন না। লোকটা একভাবে সাইকেলে প্যাডেল করে চলেছে। একমাথা সাদা চুল। পিঠটা সরু। লম্বা মতন। এদিককার অনেক রিক্সাওলাই তাঁর চেনা। কিন্তু এই লোকটাকে কোনওদিন দেখেছেন বলে মনে পড়ছে না। বুড়ো মানুষ যখন, অনেকদিন ধরেই হয়তো রিক্সা চালাচ্ছে। এপাশ ওপাশের গ্রাম থেকে আজকাল তো অনেকেই রামনগরে চলে আসছে জীবিকার খোঁজে। বুড়োশিবতলার দিকে বেশ বড়সড় বস্তি গজিয়ে উঠেছে।

প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে লোকটা চুপ মেরে গেছে আবার। ঘাড় গুঁজে রিক্সা চালাচ্ছে। হাসপাতাল আর বেশি দূর নয়। মিনিট তিন চার গেলেই...। আর একটা বাস হর্ন বাজাতে বাজাতে বেরিয়ে গেল। স্টেশনের দিক থেকে বেশ কয়েকটা রিক্সা এল পরপর। দোকানপাট এখনও খোলেনি। জেগেও জাগেনি রামনগর।

একটুক্ষণ পর প্রিয়ব্রত নিজেই জিজ্ঞাসা করলেন,

—তুমি আমাকে চেনো?

—চিনি বাবু। আপনার মেয়েকেও চিনি। কতদিন রিক্সা করে স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছি।

—ও।

—বাবু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

—বলো।

—শয়তানগুলোর কোনও হদিশ পেলেন? কারা অমন সুন্দর মেয়েটাকে...?

প্রিয়ব্রতর বুকটা ধক করে উঠল। কাজলের মুখ চোখের সামনে এসেই মিলিয়ে গেছে। জোরে শ্বাস ফেললেন,

—নাহ্।

এবার রিক্সাওলা চুপ। ঘিয়েরঙ সরকারি হাসপাতাল আর কয়েক ফুটের মধ্যে। আর পা দশেক গেল রিক্সা। তারপর বুড়ো আবার কথা বলছে,

—আমারও একটা মেয়ে আছে বাবু। ওরকমই। আমি বুঝি বাপের বুকে কী বাজে।

লোকটা মাথা নাড়ছে মৃদু মৃদু। প্রিয়ব্রতর গলার কাছে একটা শক্ত ডেলা আটকে গেল। লোকটার স্বরে কৌতূহল নয়, সহানুভূতি। এক বাপের প্রতি অন্য বাবার। শব্দ শুনেই অনুভব করা যায়।

হাসপাতালের মেন গেটে রিক্সা দাঁড় করাল লোকটা,

—আমি হলে বাবু ঠিক হারামীগুলোকে খুঁজে বার করতাম। সব কটাকে খুন করে ফাঁসি যেতে হয়, যেতাম। তবু শালা একটা শুয়োরের বাচ্চাকেও বেঁচে থাকতে দিতাম না। শেষ করে দিতাম সব কটাকে।

প্রিয়ব্রতর চোয়াল মুহূর্তের জন্য শক্ত হয়ে উঠল। সত্যিই যদি ঝাড়ে বংশে সব শেষ করে দেওয়া যেত! একেবারে মূল ধরে টান দিলে...। কিন্তু টানবে কে? প্রিয়ব্রত? একা? না। রিক্সাওলা বুড়ো যা পারে প্রিয়ব্রত তা পারেন না। মধ্যবিত্তের মন শামুকের মতো। লোকটাকে খুলে বলবেন নাকি সব কথা? বললে কি পাশে দাঁড়াবে? আজকালকার দিনে কে কার বিপদে মাথা গলায়। রিক্সাওলার মেয়েকে যদি গুণ্ডারা ধর্ষণ করত, প্রিয়ব্রত যেতেন কি? রিক্সাওলা না হয়ে লোকটা যদি নিছক প্রতিবেশী হত, তাঁরই সমগোত্রীয় কেউ, তাহলেও কি যেতেন?

ভাড়া মিটিয়ে ম্লান হাসলেন প্রিয়ব্রত।

—তোমার কি একটিই মেয়ে ভাই?

—না বাবু। চারজন। ছোটটা আপনার মেয়ের মত। তিনজনের বিয়ে দিয়েছি। এটাকে পার করতে পারলেই শান্তি। আপনার তো...

—আমার একটিই।

—জানি বাবু। শুনেছি। বি এ পাশ। ভাল মেয়ে। বলতে বলতে বৃদ্ধ মুখে সান্ত্বনা ফুটেছে, —চিন্তা করবেন না বাবু। হারামীর বাচ্চাগুলো ঠিক ধরা পড়বে। ধম্মো আছে না?

প্রিয়ব্রত আবারও ম্লান হাসলেন। ধম্মো!

২রা মে রাত সাড়ে এগারোটা

ভীষণ সরু একটা অন্ধকার গলি দিয়ে হেঁটে চলেছে সুতপা। এত সরু যে সোজা হয়ে হাঁটা যায় না ভালভাবে। দুধারে বিশাল উঁচু দেওয়াল। পাহাড়ের মতো উঁচু। গোটা রাস্তায় এক বিন্দু আলো নেই কোথাও। তবু সুতপার মনে হচ্ছিল আরেকটু এগোলেই আলো পাবে। অন্ধকার হাতড়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল একটু একটু করে। রাস্তাটা হঠাৎ দুলতে শুরু করল। আঁকাবাঁকা সাপের মতো। সুতপা যত এগোয়, সাপও চলে। সুতপা দৌড়তে শুরু করল। কোথা থেকে এসে পথ আটকে দাঁড়িয়েছে কাজল। ভাঁটার মত লাল চোখ। দাঁতে কুৎসিত হাসি। সুতপা চেঁচিয়ে উঠতে গেল। কোনও শব্দ ফুটছে না গলায়। জোর করে আওয়াজ আনতে চাইল।

ঠিক তখনই কে যেন আলগা ধাক্কা মেরেছে;

—এই তপু? কী হল? শরীর খারাপ লাগছে নাকি? এই তপু?

সুতপা ধড়ফড় করে উঠে বসল বিছানায়। মুহূর্তের জন্য চোখ খুলল। বন্ধ করল। আবার খুলল। তারপরই এক ঝটকায় ঘোর কেটে গেছে।

শোভনা উঠে জল খাওয়ালেন মেয়েকে। মশারির মধ্যে ফিরে এসে গালে কপালে ঘাড়ে জল হাত বুলিয়ে দিলেন। গলার নীচে, বুকের কাছে এত বড় একটা কালশিটে। গালে এলোমেলো নীলচে দাগ। চোখ ঠোঁট এখনও ফুলে আছে। কপালের ফাটার ওপর ছোট ব্যান্ডেজ। মেয়েকে সকালেই হাসপাতাল থেকে নিয়ে এসেছেন প্রিয়ব্রত। শারীরিক আঘাতগুলো ছাড়াও শরীর এখনও খুবই দুর্বল। হাঁটতে গেলে টলে যাচ্ছে। নার্ভের অবস্থাও বেশ খারাপ। প্রচণ্ড অবসাদ মনে। ঘুমের ওষুধেও ঘুমোতে চায় না।

শোভনা মেয়ের কাঁধ ধরে আলতো করে শুইয়ে দিলেন বিছানায়। এবার থেকে এ-ঘরেই মেয়েকে নিয়ে শোবেন। প্রিয়ব্রত আর বাবলু ও-ঘরে।

মেয়ে নিষ্পলক তাকিয়ে আছে মশারির নেটের দিকে। সকালে বাড়ি ফেরার পর থেকে কারুর সঙ্গে একটাও কথা বলেনি। অনুতোষবাবু এসেছিলেন সন্ধেবেলা। তপু ফিরেছে শুনে তো হতবাক।

—সেকি? নিয়ে চলে এলেন? এর মধ্যেই?

প্রিয়ব্রত তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন,—হ্যাঁ। ওর মা বাড়িতেই নিয়ে আসতে বলল।

শোভনা প্রতিবাদ করলেন না। কাল বিকেলে মেয়েকে আনার জন্য তিনি ব্যস্ত হয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু প্রিয়ব্রত যে ভোরবেলাই বেরিয়ে গেছেন তড়িঘড়ি

করে, ফিরেছেন সেই বেলায়, সে কথা একবারও বললেন না অনুতোষবাবুকে।

অনুতোষ জিজ্ঞাসা করলেন,—থানায় গিয়েছিলেন? কিছু জানতে পারলেন? বলেই গলা নামিয়েছেন,—তপু কিছু মনে করতে পারছে?

প্রিয়ব্রত এবারও পরিষ্কার মিথ্যা কথা বললেন, —নাহ্। এমনকী অনুতোষ একবার তপুর সঙ্গে দেখা করার জন্য এ ঘরে ঢুকতে চাইলে নির্বিকারভাবে বলে উঠলেন,—বোধহয় ঘুমোচ্ছে।

শোভনা এবারও চুপ করে থাকলেন। কাল থেকে নিজেও যে বুঝে উঠতে পারছেন না কী করবেন। মস্তানটার ভয়ে এত বড় অন্যায়টা মেনে নেবেন?

মেয়ের মাথায় আস্তে করে হাত বুলিয়ে দিলেন শোভনা,

—কিরে, কী ভাবছিস?

মেয়ে উত্তর দিল না।

—কথাই বলবি না আমাদের সঙ্গে?

মেয়ে তাও চুপ।

শোভনা নখ দিয়ে আলগা বিলি কাটলেন মেয়ের চুলে। আস্তে আস্তে হাতের তালু ঠুকলেন মেয়ের মাথায়। ঠিক যেভাবে ছোটবেলায় ঘুম পাড়াতেন।

—ঘুমো মা। ঘুমিয়ে পড়।

মেয়ে চোখ বন্ধ করল। শোভনা বেডসুইচ নেবালেন।

তারও কিছুক্ষণ পর শোভনার যখন একটু তন্দ্রামতন এসেছে, সুতপা উঠে বসল বিছানায়। সকালবেলা ফেরার পথে বাবার কথা শুনে বুক একেবারে জমাট বরফ হয়ে গেছে। আর বোধহয় কোনওদিন কোনও কিছুতেই এ বরফ গলবে না।

হাসপাতালে যখন বাবা এসে বলল, চল, তোকে নিয়ে যেতে এসেছি, তখন মুহূর্তের জন্য দুলে উঠেছিল মনটা। মুহূর্তের জন্যই। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই কটকটে যন্ত্রণাটা গোটা শরীরে দাঁত বসিয়ে দিয়েছে। মাথা ঘুরে গেল। পৃথিবী দুলে উঠল চোখের সামনে।

বাবা তাড়াতাড়ি ধরে ফেলেছে,

—কিরে, পারবি তো হাঁটতে?

কষ্ট করে মাথা নাড়ল সুতপা। বাবার কাঁধে ভর দিয়ে কোনওরকমে নিচে নামল। রিক্সায় উঠেই হুড তুলে পর্দা নামিয়ে দিয়েছে বাবা। তবু যেন বাইরের পৃথিবীটা হিংস্র জন্তুর মত ঝাঁপিয়ে পড়ছে গায়ে। তীব্র যন্ত্রণাটা অসাড় করে ফেলল দেহটাকে।

রিক্সা চলতে শুরু করলে বাবা জিজ্ঞাসা করল,

—কিরে কষ্ট হচ্ছে কোনও?

বলবে সুতপা? সব যন্ত্রণার কথা কি সব সময় বলে ফেলা যায়। শরীর নয়, কষ্টটা উঠছিল আরও গভীর কোথাও থেকে। ভয়, সংকোচ, লজ্জা, অপমান সব কিছু মেশানো এ এক অসহ্য যন্ত্রণা। পরশু রাত থেকে যন্ত্রণাটা অশরীরী আত্মার মত ভেসে বেড়াচ্ছে সুতপার চারপাশে। শরীরে ঢুকে বুকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। বুক থেকে শিরায়। ধমনীতে। দেহের প্রতি কোষে কোষে। এ যন্ত্রণা একান্তই সুতপার। একেবারে নিজস্ব। বাবাও বিশেষ প্রশ্ন করল না আর। চুপ করে বসে কি যেন ভাবছে। রিক্সা আরও খানিকটা পথ চলে যাওয়ার পর আচমকা গলা ঝেড়েছে,

—তোকে একটা কথা বলার ছিল তপু।

সুতপার বসতে কষ্ট হচ্ছিল। একটু নড়াচড়া করার চেষ্টা করল। বাবার প্রায় ফিসফিস—কাল রাত্তিরে কাজল এসেছিল বাড়িতে।

কালবৈশাখীর বাজ খুব কাছে কোথাও আছড়ে পড়লেও বুঝি এত চমকাত না সুতপা। সমস্ত শরীর বেয়ে বিদ্যুৎ খেলে গেছে।

—আমাদের ভয় দেখাতে এসেছিল। ওর নাম তুই যদি বলিস...

সুতপা স্তম্ভিত।

সুতপা হতবাক।

কাল সকালে পুলিশ অফিসার জিজ্ঞাসা করেছিল,

—তুমি সিওর যাদের নাম বলছ তারাই...ভেবে দ্যাখো। আমাকে তাদের অ্যারেস্ট করতে হবে কিন্তু।

কষ্ট করে উত্তর দিয়েছিল সুতপা, —আমি কাজল দত্তকে চিনি।

—কাজল দত্তর সঙ্গে তোমার কতদিনের ভাব?

—পাড়ার ছেলে। ছোটবেলায় খেলা করেছি একসঙ্গে।

—কাজল দত্তর ওপর তোমার রাগ ছিল কোনও?

সুতপা থমকে ছিল এ প্রশ্নে। রাগ অভিমান থাকার মত সম্পর্ক কাজলদার সঙ্গে কি থাকার কথা? তবে হ্যাঁ। রাগ তো একটু ছিলই। একটা ছেলে চোখের সামনে নিজেকে নষ্ট করে ফেললে রাগ হয় না? পৃথিবীতে এত ভাল ভাল ছেলে থাকতে সুজয়, পিঙ্কার মত ছেলেদের সঙ্গে...

পুলিশ অফিসার নতুন করে প্রশ্ন করেছিল,

—কি হল বললে না? তুমি কাজলকে অপছন্দ করতে?

কথা বলতে অসুবিধে হচ্ছিল সুতপার। খুব আস্তে মাথাটাকে নেড়েছিল

কোনরকমে,—হ্যাঁ।

—কাল তো সন্ধে থেকে কারেন্ট ছিল না রামনগরে। অন্ধকারে তুমি ওদের চিনলে কি করে?

সুতপা চুপ করে রইল। ভদ্রলোক কি বলতে চাইছিলেন? চেনা লোকদের চেনবার জন্য আলোর দরকার হয়! তাছাড়া কাজলদার সঙ্গে তার আগেই দেখা হওয়া...কথা বলা...

—জানো তো, একটা ছেলের নামে এ ব্যাপারে ফল্‌স অভিযোগ করলে তার জীবনটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে? তাছাড়া সুজয়, পিঙ্কাকে তো তুমি...তোমার মত মেয়ের তো চেনারও কথা নয়...

এক তীব্র যন্ত্রণায় সুতপা মাথা নাড়তে থাকল দুদিকে। তিনটে হিংস্র পশু মিলে ক্ষতবিক্ষত করেছে তাঁকে। শরীরে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তার চিহ্ন বহন করছে সে।...আইনের রক্ষক এসে রক্ষা করতে চাইছে সেই জন্তুগুলোকে।...জন্তুগুলো এসে দাপিয়ে যাচ্ছে তাদের বাড়িতে। ভয় দেখাচ্ছে।

একটানে সুতপা বুক থেকে ফেলে দিল আঁচলটা। দুহাতে ছিঁড়ে ফেলল ব্লাউজ। ডুকরে কেঁদে উঠল।

শোভনা পলকে বেডসুইচ টিপেছেন। সুতপা কাঁদতে কাঁদতে মাথা ঠুকে চলেছে বালিশে। চুল খুলে ছড়িয়ে পড়েছে। সম্পূর্ণ বিকারগ্রস্ত। এ মেয়েকে এ ভাবে কখনও দেখেননি শোভনা! সজোরে কাঁধ চেপে ধরে ঝাঁকাতে লাগলেন,

—তপু? এই তপু?

তাঁকে প্রায় ছিটকে দিয়ে উঠে বসল সুতপা। মায়ের হাত চেপে ধরে টেনে আনল নিজের শরীরের ওপর। একটা একটা করে ক্ষতস্থান দেখাচ্ছে,

—এগুলো সব মিথ্যে? বলো? বলো?

—কে বলেছে মিথ্যে?

—তবে কেন তোমরা জানোয়ারগুলোর নাম বলতে বারণ করছ?

—কে বারণ করেছে তোকে?

—তোমরা। তোমবা। তোমবা ভয পাচ্ছ। পুলিশও এসে আমাকে.

শোভনা দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন মেয়েকে। বুকের কাছে মাথা টেনে এনে শান্ত করার চেষ্টা করলেন,

—আমি বারণ করিনি।

অনুতোষ উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন,

—কখন হয়েছিল এসব? কবে এসেছিল?

—পরের রাত্তিরেই। দলবল নিয়ে...

—আপনারা আমাকে একবার বলতে পারতেন। এত কাণ্ড হয়ে গেছে...

—উনি আসলে ভীষণ ঘাবড়ে গেছেন। এমনিতেই তো দিশেহারা অবস্থা। একদম ভেঙে পড়েছেন। কাউকে কিছু জানাতে চাইছেন না। আমি ওঁকে লুকিয়ে...

—লুকিয়ে থাকলে সব কিছু সলভ হয়ে যাবে?

—তা নয়। উনি আসলে ভয় পাচ্ছেন যদি ওরা সত্যিই কিছু করে...

—বাকি কি রেখেছে?

শোভনা মাথা নামালেন। বাকি কিছু নেই ঠিকই। তবু অস্তিত্বের মূল শিকড়টাই বিপন্ন হয়ে পড়লে কে না আতঙ্কিত হয়! শামুককে আচমকা খোঁচা দিলে প্রথমে খোলের ভেতর গুটিয়ে যায় সত্য তবু তারপরও শুঁড় বাড়ানোর চেষ্টা করে। লাঞ্ছনা সহ্য করেও নিজের অস্তিত্বকে জিতিয়ে দিতে চায়। কিন্তু খোলসটাই যদি কেউ ভেঙে চুরমার করে দেওয়ার ভয় দেখায়! তখন! তখন কি আর সাহস থাকে এগোনোর! প্রিয়ব্রতর এখন যে সেই অবস্থা। শোভনা অনুভব করতে পারছেন, মাত্র তিনটে দিনের মধ্যে কী ভীষণ বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছেন মানুষটা। চোখেব নিচে কালি। দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। সব বুঝেও শোভনা মেনে নিতে পারছেন না কিছুতেই। একদিকে মেয়ের চূড়ান্ত অপমান, জীবনের প্রতি বিশ্বাস হারানোর প্রশ্ন। অন্যদিকে...

অনুতোষ আবার প্রশ্ন করলেন, —প্রিয়বাবু ব্যাপারটা রিপোর্ট করে এসেছেন থানায়?

শোভনা লম্বা নিঃশ্বাস ফেললেন, —কাল গিয়েছিলেন। আমিই পাঠিয়েছিলাম জোর করে। মেয়েটার অবস্থা আর চোখে দেখা যাচ্ছে না।

—পুলিশ কি বলল?

—ওসি আরও ইনভেস্টিগেট না করে অ্যারেস্ট করতে চাইছেন না। শুধু তপুর কথার উপর নির্ভর করে নাকি ওদের ধরা যায় না। কাজলের ওপর ব্যক্তিগত কোনও আক্রোশ থেকে নাকি তপু তাদের নাম বলে থাকতে পারে।

—রাবিশ। অনুতোষ প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, —কে বলেছে এসব কথা? হি শুড অ্যারেস্ট দেম ফার্স্ট। এটাই আইন।

শোভনা দু আঙুলে কপাল টিপে ধরলেন। কালও সারারাত একবারের জন্যও

দু চোখের পাতা এক করতে পারেননি। প্রিয়ব্রতও জেগে বসেছিলেন ঠায়। রাতভর বাইরে একটা ছোট্ট শব্দ হলেও কাঁটা হয়ে উঠেছেন। বাবলুও বারবার উঠছিল। শুচ্ছিল। কিশোব মনে কী ভীষণ প্রতিক্রিয়া ঘটে চলেছে মুখ দেখলেই বোঝা যায়। মাকে ঘুরে ফিরে প্রশ্ন করছে, —কিচ্ছু করা যাবে না? মুখ বুজে সহ্য করে যেতে হবে? বলার সময় ভেতরকার চাপা ক্রোধ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে মুখে। কখন কি করে বসে কে জানে। একমাত্র মেয়েটাকেই যা ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পেরেছেন শোভনা। তাও মেয়ের মুখে যে প্রচন্ড ঘৃণা ফুটে উঠতে দেখেছেন তা বুঝি কোনও ভাষাতেই বর্ণনা করা যায় না। ভয়ে চুপ করে থাকলে মেয়ে কি কোনওদিন ক্ষমা করতে পারবে তাঁদের? নিজেকেও কি নিজে ক্ষমা করবেন শোভনা?

অনুতোষ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। শোভনার পাশে থমথমে মুখে বসে তাঁর স্ত্রী। সুরমা। ভেতরে যাওয়ার দরজার চৌকাঠে নিশ্চল দাঁড়িয়ে ঝর্ণা। অনুতোষের হৃদপিণ্ডটা চমকে উঠল। সুতপা আর ঝর্ণা সমবয়সী প্রায়। সেই ছোট্ট থেকে একসঙ্গে বড় হয়েছে। ঘটনাটা সুতপার না হয়ে ঝর্ণারও তো হতে পারত!

অস্থির পায়ে জানলার পাশে গেলেন,

—ভয় দেখিয়ে যাওয়ার কথা প্রিয়বাবু থানায় বলেছেন?

শোভনা মুখ তুলে বললেন, —উনি সবই বলেছেন।

—তারপরও কিছু স্টেপ নেবে না পুলিশ! স্ট্রেঞ্জ!

—এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? সুরমা কথা বলে উঠলেন মাঝখানে,

—তোমার কি এখনও সন্দেহ আছে নাকি যে ওদের পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ নেই? ওসি-ই তপুর সঙ্গে কথা বলার পর ওদের সব জানিয়ে দিয়েছে।

আর সেজন্যই তো উনি কিছুতেই থানায় যেতে চাইছিলেন না।

অনুতোষ বিচলিত মুখে আবার বসে পড়লেন চেয়ারে,

—ওসির সঙ্গে ঠিক কি কি কথা হয়েছে খুলে বলুন তো।

শোভনা আবারও একটা বড় শ্বাস ফেললেন,

—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একরকম ওঁকে সাবধানই করেছেন ভদ্রলোক। সমস্ত ব্যাপারটা চেপে গেলে নাকি আমাদেরই মঙ্গল।

—আর?

—কাজলদের নাকি প্রচুর ক্ষমতা...এম এল এ-র সঙ্গে খাতির...বাবলুকে রাস্তায় ঘাটে বেরোতে হবে...কোথায় কখন কি হয়ে যায়...ছেলেটার তো একটা ভবিষ্যত আছে..উনি তো আর সারাজীবন পাহারা দিতে পারবেন না...

—তার মানে ভয় দেখিয়েছে? কিছুই করবে না? তাই তো?

—ভদ্রলোক নাকি কথা প্রসঙ্গে হা-হুতাশও করেছেন অনেক। আজকাল নেতাদের চাপে পড়ে পুলিশ নাকি কাজ করতে পারে না...নাকের ডগা দিয়ে অপরাধীরা ঘুরে বেড়ায়...চাকরি বাঁচানোর জন্য পুলিশকে...

—বাহ্। সেইজন্য ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে অ্যালার্ট করে দিয়েছেন গুণ্ডাগুলোকে! চমৎকার। রক্ষকই ভক্ষক।

সুরমা বললেন, —কিচ্ছু হবে না। যে সমাজে বাস করি সেখানে এর থেকে বেশি কি আশা করতে পারি আমরা?

—তা বলে চুপ করে থাকতে হবে?

—আমার তো মনে হয় সেটাই ঠিক কাজ হবে। কি দরকার ঘাঁটাঘাঁটি করার? তপুটা ভালয় ভালয় সুস্থ হয়ে উঠুক...

—কখখনো না। ঝর্ণা সহসা কথা বলে উঠেছে—আমাদের মান-সম্মানের কোনও দাম নেই? ওদের এভাবে বাড়তে দিলে যা খুশি তাই করবে এর পর। যে কোনও মেয়েকে যখন তখন...

—ঠিক বলেছিস। অনুতোষের মুখ লাল হয়ে উঠল, —সবাই ভেবেছেটা কি? দেশে আইন কানুন বলে কিছুই নেই? আমরা এম এল এ-র কাছে যাব। দরকার হলে মিনিস্টার, চিফ মিনিস্টার। খবরের কাগজে ফ্ল্যাশ করব সব। আর ওই ওসির আমি খবর নিচ্ছি। আজই এস পি-র সঙ্গে দেখা করব। ওদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার বাবারও বাবা আছে।

সুরমা আচমকা বলে বসলেন—দ্যাখো, আমার মনে হয় কিছু করার আগে আরও ভালভাবে চিন্তা করা দরকার। তুমি একা এগোলে ওরা তোমার পেছনেও লেগে যেতে পারে। তোমাকেও এখানে বাস করতে হবে। তোমারও একটা মেয়ে আছে।

কথাটায় পরিষ্কার ইঙ্গিত আছে। শোভনা অস্বস্তি বোধ করলেন। চোখ দুটো জ্বালা জ্বালা করে উঠল। অনেক আশা নিয়ে সাতসকালে অনুতোষবাবুর কাছে ছুটে এসেছেন। প্রিয়ব্রত যেরকম ভেঙে পড়েছেন তাঁকে নিয়ে আর এক পাও এগোন যাবে না। কাল থানা থেকে ফেরার পর সম্পূর্ণ পরাজিত মানুষ একটা। বাড়িতে ঢুকেই সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলেন,

—বাবলু...বাবলু...?

—কি হয়েছে?

—বাবলু কোথায়?

—কোথায় আবার। ঘরেই। দুদিন ধরে ওকে বাইরে বেরোতে দেখেছ?

—বেরোবে না। এক পা'ও যেন না বার হয় বাড়ির থেকে।

বলতে বলতে হাঁপাচ্ছেন ভীষণভাবে। দরদর করে ঘামছেন। চেয়ারে বসে পড়লেন ধপ করে। দেখতে দেখতে চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। হাঁ করে শ্বাস টানছেন।

শোভনা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন খুব। তাড়াতাড়ি জল এনে ছিটিয়েছিলেন মানুষটার মুখে। ছেলেকে ডেকেছিলেন।

—এই বাবলু। তাড়াতাড়ি একবার আয় দেখি।

অনেকক্ষণ চুপ থেকে কথা বলেছিলেন প্রিয়ব্রত,

—শোন, আমি সব ঠিক করে ফেলেছি।

—কি?

—কালই অফিস গিয়ে কলকাতায় বাড়ি দেখছি। যত তাড়াতাড়ি পারি রামনগর ছেড়ে চলে যাব। পারলে দু-চার দিনের মধ্যেই।

—বাড়িটার কি হবে?

—বেচে দেব। আত্মীয়স্বজন কাউকে কিছু জানানোর দরকার নেই। অন্য কোথাও গিয়ে নিশ্চিন্তে তপুর বিয়ে দিয়ে দেব আগে। বাবলুরও রেজাল্ট বেরোলে ভাল কোথাও ভর্তি হয়ে যেতে পারবে।

কী সহজ সরল সমাধান! নিশ্চিন্ত পলায়ন! পালিয়ে গেলেই যেন সব দাগ মুছে ফেলা যায়। একবারও প্রিয়ব্রত বুঝতে চাইছেন না তাঁর আদরের মেয়ে এখন ঝুলছে অস্তিত্বের সীমারেখায়।

প্রিয়ব্রতর মত সুরমাও পালিয়ে থাকতে চাইছেন। এ পালানোর চেহারা অবশ্য অন্যরকম। এটুকু জানেন না প্রতিটি মধ্যবিত্তের বাড়ি কাচের বাড়ি। আত্মসম্মানের কাচ। ঢিল মেরে একটা বাড়ি কেউ ভেঙে দিলে অন্য একটা কাচের বাড়িতে উটপাখির মত মুখ বুজে বসে থাকা হয়ত যায়; লাভ হয় না। একটা ঢিল মেরে যে আনন্দ পেয়েছে সে দ্বিতীয় ঢিলও মারতে পারে। মারবেই।

কথাগুলো মনে মনে ভাবলেও শোভনা অবশ্য মুখ ফুটে বললেন না কিছুই। চৌকি ছেড়ে নিশব্দে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

অনুতোষও উঠে দাঁড়ালেন সঙ্গে সঙ্গে—চিন্তা করবেন না। রাস্তা একটা খুঁজে বার করবই। এভাবে চলতে পারে না।

শোভনার চোখে জল এসে গেল। দাঁতে ঠোঁট চেপে মাথা নাড়লেন—আসি এখন।

শোভনা চলে যাওয়ার পর অনুতোষ ফেটে পড়লেন রাগে,

—ওদের ওরকম বিপদের সময় ওভাবে কথা বলতে তোমার খারাপ লাগল না? ছিঃ।

কথাটা বলে ফেলে সুরমারও যে খারাপ লাগেনি তা নয়। তবু তর্কের খাতিরে বলে উঠলেন—ঠিকই বলেছি। আমরা কেন আগ বাড়িয়ে হাঁড়িকাঠে মাথা দিতে যাব? আরও অনেক লোক আছে পাড়ায়।

—থাকতে পারে। কিন্তু বিপদে পড়ে আমাদের কাছেই যখন এসেছে, আমরা মুখ ঘুরিয়ে নেব? তুমি না বলো শোভনা তোমার খুব বন্ধু?

সুরমা উত্তর দিলেন না।

অনুতোষ নিজের মনে বলে চললেন—এত বড় একটা অন্যায়...যারা দোষ করেছে তারা চোখের সামনে বুক বাজিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে...

—সে তো সব সময় ঘোরে। সুরমা আরও কঠিন সত্যটা বলে ফেললেন এবার—তোমরাই তো এদের বেড়ে উঠতে দিয়েছ। গতবার ইলেকশনের আগে দু-দুটো ছেলেকে নৃশংসভাবে খুন করা হল। কারা করেছিল? ওয়াগন ব্রেকিং, রাহাজানি, ছিনতাই, বোমাবাজি যা ইচ্ছে করে বেড়াচ্ছে এরাই। মানুষকে মানুষ বলে জ্ঞান করে না। তোমরা এ সবের প্রতিবাদ কেউ করেছ কোনদিন?

অনুতোষ চুপ করে থাকলেন কয়েক মুহূর্ত। এ কথার উত্তর তাঁর কাছে নেই। আজকে প্রতিবাদ না করাটা যেমন অন্যায়, অন্য সময় প্রতিবাদ করতে পারলে এখনকার ঘটনাটা হয়ত ঘটতই না। তাঁদেরই নিষ্ক্রিয়তায় একটু একটু করে বেড়ে ওঠে কাজলরা।

মেয়েটা চুপ করে তাকিয়ে আছে তাঁদের দুজনের দিকে। অনুতোষ তার মাথায় গিয়ে হাত রাখলেন। বুঝতে পারছেন কিছু একটা বলা উচিত। কি বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না। মাথা নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন।

৪ঠা মে দুপুর দুটো

ছেলে দুটোর বয়স ত্রিশ পঁয়ত্রিশের মধ্যে। একজনের চোখে চশমা। চাপ দাড়ি। নীল রঙের শার্ট আর ঘিয়ে প্যান্ট পরেছে সে। অন্যজন পা'জামা পাঞ্জাবি পরা। ফর্সা। সাধারণের তুলনায় একটু বেশিই লম্বা।

প্রিয়ব্রত দরজা অল্প ফাঁক করে জিজ্ঞাসা করলেন, —কি চাই?

—এটা কি সুতপা বসুর বাড়ি?

দরজার ফাঁকটা আরও সরু করে দিলেন প্রিয়ব্রত,

—কেন বলুন তো?

চাপ দাড়ি উত্তর দিল, —আমরা রামনগর বার্তা থেকে আসছি। আপনাদের কাছে কয়েকটা কথা জানার ছিল।

পলকে পেছন ঘুরে দেখে নিলেন প্রিয়ব্রত। একটু আগে শোভনা খাওয়াদাওয়া সেরে মেয়ের পাশে গিয়ে শুয়েছেন। খাওয়া বলতে দুমুঠো কোনভাবে নাকে মুখে গোঁজা। কদিন ধরে বাড়ির কে'ই বা খেতে পারছে ভাল করে! তবুও খেতে হয়। ক্ষিধেও পায় সময়মত। শরীরের এ এক আশ্চর্য চাহিদা।

যতটা সম্ভব গলা নিচু করলেন প্রিয়ব্রত। কোনভাবেই যেন বাইরের ঘর পেরিয়ে শব্দ অন্দরে না যায়।

—কি জানতে চান?

ছেলে দুটো মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। সেকেন্ডের জন্য। লম্বা ছেলেটি কথা বলল পরক্ষণেই,

—আমরা কি একটু ভেতরে যেতে পারি?

ছেলে দুটোর মুখের ওপর সহজেই 'না' বলে দরজা বন্ধ করে দেওয়া যায়। তারপর? যদি আবারও আসে? যদি বাবলু কিম্বা শোভনার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়? সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হল না প্রিয়ব্রতর। মুখ বাড়িয়ে বাইরেটা দেখে নিলেন ভাল করে। ভরদুপুরে এ সময় পাড়া নির্জনই থাকে। আশপাশের বাড়িগুলোকে এক মনে চেটে চলেছে বৈশাখের রোদ। উল্টোদিকে ব্যানার্জিবাবুদের জানলায় চোখ আটকে গেল। ব্যানার্জিবাবুর ছেলের বউ কৌতূহলী চোখে পর্দা সরিয়ে এদিকেই দেখছে যেন। সুতপাকে নিয়ে আসার পর পাড়াপ্রতিবেশীর আসা একটু কমেছে। কেন আসছে না? নেহাতই ভদ্রতাবোধ? নাকি অকারণ ঝামেলায় কেউ জড়াতে চায় না নিজেকে? ভালই হয়েছে অবশ্য। প্রিয়ব্রত বাইরে বেরিয়ে দরজার পাল্লাদুটোকে আস্তে টেনে দিলেন। সাবধানে।

—ভেতরে বসার একটু অসুবিধে আছে। যা জিজ্ঞেস করার এখানেই করুন।

ছেলে দুটো আবার পরস্পরের দিকে তাকিয়েছে। চাপ দাড়ি বিনীতভাবে বলে উঠল—আপনাদের মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। নিশ্চিন্ত থাকুন আমরা আপনার মেয়ের নাম খবরে উল্লেখ করব না। আমরা শুধু কাগজে ঘটনাটাব তীব্র নিন্দা করতে চাই। দিনদিন যেভাবে আইন শৃঙ্খলার অবনতি হয়ে চলেছে...

—কি জানার আছে? প্রিয়ব্রত অধৈর্য হলেন। নিজের অজান্তে চোখ বারবার চলে যাচ্ছে ব্যানার্জিবাবুর জানলার দিকে।

—আপনি নিশ্চয়ই সুতপা দেবীর বাবা?

প্রিয়ব্রত ঘাড় নাড়লেন।

—আমরা পরশুদিন হাসপাতালে গিয়েছিলাম। শুনলাম আপনি বন্ড দিয়ে মেয়েকে নিয়ে চলে এসেছেন। লম্বা ছেলেটির স্বর যথেষ্ট ভদ্র।

—ঠিকই শুনেছেন। প্রিয়ব্রত উত্তর দেওয়ার জন্য তৈরি করে নিলেন নিজেকে।

যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ছেলে দুটোকে বিদায় করতে হবে।

—আপনি যদি অনুমতি করেন তাঁর সঙ্গে একটু দেখা করার ইচ্ছে ছিল। কথা দিচ্ছি একটাই শুধু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব।

—না। প্রিয়ব্রত আঁতকে উঠলেন প্রায়—ওর শরীর খুব খারাপ। যা জানার আমার কাছ থেকেই জেনে নিন।

—উনি কি কালপ্রিটদের কারুর নাম বলতে পেরেছেন?

—না। এখনও সেরকম মানসিক অবস্থা আসে নি।

—হাসপাতালে ওসি নিজে গিয়েছিলেন শুনলাম। তখনও কি...?

—হ্যাঁ। তখনও কথা বলার মত অবস্থা ছিল না।

—ত্রিশ তারিখ ঠিক কটার সময় ঘটনাটা ঘটে ছিল?

—নটা, সাড়ে নটা হবে।

—উনি কোথায় গিয়েছিলেন?

—পড়াতে গিয়েছিল। বৃষ্টির জন্য দেরি হয়ে যায়।

—ওই নোংরা কাজে কজন ছিল কিছু জেনেছেন?

—না।

—পুলিশ এ ব্যাপারে কি স্টেপ নিয়েছে?

—বলতে পারব না।

—পুলিশ কি আপনাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করছে বলে আপনার মনে হয়?

এবারও প্রিয়ব্রত মিথ্যা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ পেছনে শব্দ পেয়ে থমকে গেলেন। বাবলু কখন এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। এক মুহূর্ত দেরি না করে প্রিয়ব্রত একরকম ধাক্কা দিয়েই ছেলেকে ঢুকিয়ে দিলেন ঘরে। দিয়েই ছেলে দুটোর মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলেন।

—তোকে কে বাইরে বেরোতে বলেছে?

বাবলু যেন শুনেও শুনল না। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে।

—ওরা কারা?

—তোর জানার কি দরকার?

বাবলু তবু প্রশ্ন করল,—তুমি ওদের সত্যি কথা বললে না কেন?

প্রিয়ব্রত চিৎকার করে উঠলেন—বেশ করেছি। তোকে কে পাকামি করতে বলেছে? বারণ করেছি না কারুর সামনে বেরোবি না?

চিৎকারটা একটু জোরেই হয়ে গেছে কি? নইলে শোভনা কেন ছুটে এল শোবার ঘর থেকে?

—কি ব্যাপার? কি হয়েছে?

—কি হয়েছে বাবাকেই জিজ্ঞাসা করো।

—জিজ্ঞাসা করার কি আছে? প্রিয়ব্রতর গলা আরও উঁচুতে উঠল—যে কেউ যখন-তখন বাড়িতে এলেই ভ্যাকভ্যাক করে সব কথা বলে দিতে হবে তাকে? ওরা ওদের লোকও হতে পারে। হয়ত পরীক্ষা করে দেখতে এসেছিল আমাদের।

শোভনা অবাক দৃষ্টিতে তাকালেন দুজনের দিকেই,

—কাদের লোক এসেছিল! কখন এসেছিল!

প্রিয়ব্রত সোফায় বসে পড়লেন। নিজের চকিত উত্তরে নিজেই ভয় পেয়ে গেছেন। ছেলে দুটো যে কাজলদের লোক হতে পারে কথাটা এক সেকেন্ড আগেও মাথায় আসেনি। হতেও তো পারে। প্রিয়ব্রতর সারা শরীর কেঁপে উঠল নতুন করে। দুহাতে মুখ ঢেকে ফেললেন।

বাবলু কিছু বলতে যাচ্ছিল, শোভনা ইশারায় বারণ করলেন ছেলেকে। স্বামীর পাশে এসে নরম গলায় বললেন—জানি না কে এসেছিল। কেনই বা এসেছিল। তবে একটা কথা তোমাকে বলে দিতে চাই।

প্রিয়ব্রত হাত সরালেন না মুখ থেকে।

—আমি মনস্থির করে ফেলেছি। কিছুতেই আমরা হার স্বীকার করে নেব না। যা হয় হবে। কালকেই এম এল এ-র সঙ্গে আমি নিজে গিয়ে দেখা করব।

—তোমাকে শক্ত হতেই হবে বাবা।

প্রিযব্রত তবু কাঁদছেন ভীষণ।

শোভনা এবার হাত রাখলেন তাঁর কাঁধে—ওঠো। তপুর কাছে গিয়ে একটু বসবে চলো। তুমি না সাহস দিলে মেয়েটা জোর পাবে কোথ্‌থেকে?

৫ই মে সকাল সাড়ে আটটা

লোকটা ডাকল, —আসুন। একটু অপেক্ষা করতে হবে।

বড়সড় ঘরটার দুদিকে দুটো লম্বা সোফা টানা পাতা। ভেতরের দিকের দেওয়াল ঘেঁষে প্রকাণ্ড এক সেক্রেটারিয়েট টেবিল। টেবিলের ওপাশে সিংহাসনের মত বিরাট এক চেয়ার ছাড়াও তিন দিকে খান কয়েক ফাইবারগ্লাসের কুর্শি সাজানো রয়েছে। এদিকেও, সোফা দুটোর এ প্রান্তে, জানলার দুপাশে আরও কিছু টুল। সেই টুলগুলোর একটাতেই বসতে যাচ্ছিলেন অনুতোষ, লোকটা বাধা দিল,

—না, না। ওখানে না। এখানে বসুন। সোফায়।

অনুতোষের সঙ্গে শোভনা প্রিয়ব্রতও বসলেন সোফায়। আড়ষ্টভাবে। শোভনা

হালকা সবুজ দেওয়ালে চোখ বোলালেন কয়েক সেকেন্ড। পরপর ছবির লাইন। দেশনেতার। মণীষীদের। দেশি, বিদেশী। এক দেওয়ালে বড় বড় অক্ষরের ছবিহীন লাল-সাদা ক্যালেন্ডার।

অনুতোষ জিজ্ঞাসা করলেন,

—উনি নামবেন কখন?

—নামবেন। সময় হয়ে গেছে। লোকটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের কাছে গিয়ে কাগজপত্র গুছিয়ে রাখল। এক গোছা চিঠি উল্টে পাল্টে দেখে চাপা দিল পেপার ওয়েট দিয়ে।

—আসলে, রমেনদা কাল অনেক রাত্রে ফিরেছেন তো...। মে ডে উপলক্ষে আসানসোলে বড় একটা লেবার কনফারেন্স হল। অ্যাটেন্ড করতে বেরিয়েছিলেন সেই তিরিশ তারিখ বিকেলে। খুব ধকল গেল কদিন।

—ও। অনুতোষ মাথা নাড়লেন।

রমেন সিংহ দীর্ঘদিন এ অঞ্চলের সিটিং এম এল এ। খুব নাম করা লেবার লিডার। সারা পশ্চিম বাংলার প্রায় সব বড় বড় কলকারখানার মজদুর ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত। কোথাও সভাপতি। কোথাও উপদেষ্টা। প্রচণ্ড জ্বালাময়ী বক্তৃতা করতে পারেন। শুনলে রক্ত গরম হয়ে ওঠে। এক সময় এই বক্তৃতা দিয়ে হাজার হাজার শ্রমিকদের এককাট্টা করেছেন, মালিকপক্ষের চক্ষুশূল হয়েছেন। পঁচাত্তরে, এমারজেন্সির সময় জেল খেটেছিলেন। তখন রামনগরের এত রমরমা কোথায়? রামনগরের মানুষ রমেন সিংহ তখন থাকতেন স্টেশনের ধারে একটা ভাড়া বাড়িতে। সাতাত্তরের ইলেকশনে প্রথম পার্টির টিকিট পেলেন। সেই থেকে তেরো বছর ধরে রামনগরেরই বিধায়ক। রামনগরের এত উন্নতি, কলকারখানা রাস্তাঘাট সব কিছুর পেছনে এই মানুষটার অবদান কেউই অস্বীকার করতে পারে না। রামনগরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই মানুষটার যে উন্নতি হবে, এ তো স্বাভাবিক। ধুতি জামা ছেড়ে দামি প্যান্ট শার্ট পরেন এখন। বিড়ি ছেড়ে সিগারেট। স্টেশনের ধারেই বছর পাঁচেক হল দোতলা বাড়ি তুলে ফেলেছেন। বাড়িরই একটা অংশ দিয়েছেন পার্টি অফিসকে। অনুতোষের সঙ্গে এককালে ভালই পরিচয় ছিল। সেও প্রায় বছর দশেক আগের কথা। এর মধ্যে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। এখন চিনতে পারবেন কি না কে জানে!

লোকটা ঘুরে কোণার দিকের টেবিলে গিয়ে কি সব লিখছে। একে আগে দেখেননি অনুতোষ। মনে হয় এক নম্বর মোসাহেব। আজকাল নেতাদের পাশে এরকম অসংখ্য স্যাটেলাইট ঘুরছে। এরা কথা বলে বেশি। শোনে কম। এই যেমন এখনই লোকটা লেখা শেষ করে কোণায় বসা রোগামতন যুবকটির সঙ্গে

অনর্গল কথা শুরু করেছে। ছেলেটিও মুগ্ধ শ্রোতার দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার দিকে।

—হ্যাঁ রে। সুভাষ পল্লীর জমির কেসটা কি হল রে শেষ পর্যন্ত?

ছেলেটি কি একটা উত্তর দিতে গেল, তার আগেই লোকটা বলে উঠেছে—রমেনদা আমাকে নিজে ওই কেসটার ভার দিয়েছিলেন বুঝলি। অনেক কিচাইন আছে...সেই মনে আছে আগেরবার সেই ধান কাটার ডিসপিউট নিয়ে...শালা শুঁটে ভট্‌চার্য কেলো বাধানোর চেষ্টা করেছিল...এবারও শালা...

লোকটার কথার মধ্যেই আরও জনা চারেক লোক হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল ঘরে। ঢুকেই সোফায় বসে পড়েছে। সকলেই রমেন সিংহর দর্শনার্থী। রামনগরে থাকলে নিয়ম করে রোজ সকালে ঘণ্টাখানেক এলাকার মানুষের কথা অভিযোগ শোনেন রমেনবাবু।

শোভনা ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন,

—এত লোকের সামনে সব কথা বলা যাবে তো?

অনুতোষ ভুরু ওঠালেন—দেখি। দরকার হলে...

অনুতোষের কথা শেষ হওয়ার আগেই ভেতরের দরজা দিয়ে ঢুকলেন রমেন সিংহ। হাসিহাসি মুখে সকলের দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে নমস্কার করলেন। তারপর ধীরে সুস্থে গিয়ে বসলেন গদিমোড়া বড় চেয়ারে। বসেই অনুতোষের দিকে তাকিয়ে আলাদাভাবে হাসলেন,

--কি খবর? ভাল?

অনুতোষ হাতজোড় করে প্রতিনমস্কার জানালেন,

—আপনার কাছে একটু বিশেষ দরকারে এসেছি।

বক্তৃতাবাজ লোকটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চলে গেছে রমেনবাবুর পাশে। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে নিচু স্বরে কি যেন বলছে। রমেনবাবু ঘুরে তাকালেন। তাঁদেরই দেখছেন। ভুরু কুঁচকে ঘনঘন মাথা নাড়লেন। প্রিয়ব্রত খুবই সংকুচিত বোধ করলেন। লোকটা তাঁদের এখানে আসার কারণ মনে হয় ভালমতই জানে। এতক্ষণ ঘুণাক্ষরেও বুঝতে দেয়নি কিছু।

লোকটার সঙ্গে কথা শেষ করে রমেনবাবু হাতের ইশারায় তাঁর সামনে এসে বসতে বললেন অনুতোষদের।

ভদ্রলোকের মুখোমুখি বসে শোভনা নতুন করে মাথার আঁচল ওঠালেন। মনে মনে কথাগুলোকে গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেন আপ্রাণ।

অনুতোষ ঝুঁকলেন সামান্য—ইনি আমার বন্ধু প্রিয়ব্রত বসু। ইনি...শোভনা

রমেনবাবু শোভনার দিকে তাকালেন সোজাসুজি,

—বলুন। কি ব্যাপার?

শোভনা বার দুয়েক ঢোক গিললেন। কথা শুরু করতে অস্বস্তি হচ্ছে প্রথমটা।

—আপনি বোধহয় শুনেছেন ত্রিশ তারিখ রাত্রে সুতপা বসু বলে একটি মেয়েকে...

—দাঁড়ান। রমেনবাবু কথার মাঝখানেই থামিয়ে দিয়েছেন শোভনাকে। উঠে দাঁড়িয়েছেন—আপনারা আমার সঙ্গে এ ঘরে আসুন।

বড় ঘরের পাশেই ছোট ঘর। অ্যান্টি চেম্বার। এখানেও টেবিলে দুখানা টেলিফোন, চিঠিপত্র কাগজ সব সাজানো কাচের ওপর। অনুতোষরা চেয়ারে বসার পর রমেনবাবু এবার প্রিয়ব্রতর দিকে তাকালেন,

—আপনি মেয়েটির বাবা?

প্রিয়ব্রত আরেকবার নমস্কার জানিয়ে বললেন—হ্যাঁ।

—ঘটনাটা আমি শুনেছি। রমেনবাবুর মুখে চকিত সহানুভূতির ভাব—বিশ্বাস করুন, আমার সমবেদনা জানানোর কোনও ভাষা নেই। এমন একটা জঘন্য কাজ...আমি নিজেই আপনাদের ওখানে যাব ভেবেছিলাম...এমন বিশ্রীভাবে অকুপায়েড হয়ে গেলাম।...কেমন আছে এখন মেয়ে?

প্রিয়ব্রত ঠিক এতটা আশা করেননি। কৃতজ্ঞতায় চোখ ভিজে এল।

শোভনা উত্তর দিল,

—খুব দুর্বল। শরীরের থেকেও মনে বেশি আঘাত পেয়েছে। বাড়িতে নিয়ে এসেছি।

—আমি একদিন যাব। মেয়েকে বোঝাবেন ভেঙে পড়ার কিছু হয়নি। ওর রিহ্যাবিলিটেশনের জন্য যদি কিছু দরকার হয় আমি নিশ্চয়ই...

—আমরা ঠিক সেজন্য আপনার কাছে আসিনি। স্পষ্টভাবে বললেও শোভনার গলা সামান্য কেঁপে গেল।

রমেনবাবু থমকালেন একটু। পকেট থেকে ফিলটার উইলসের প্যাকেট বার করলেন। লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরালেন। প্রথম ধোঁয়াটা ভাসিয়ে দিয়ে হেলান দিলেন চেয়ারে,

—হ্যাঁ বলুন।

সিগারেটের ধোঁয়া দিয়ে কি আত্মরক্ষার বর্ম তৈরি করলেন ভদ্রলোক? সময় নেওয়ার ভঙ্গি দেখে অনুতোষের ঠিক এই প্রশ্নটাই মনে এল। শোভনা বা প্রিয়ব্রত কারুরই অত লক্ষ করার মত মানসিক অবস্থা নেই। প্রিয়ব্রত তো চুপ করে বসে আছেন। জড়োসড়ো ভাব এখনও। শোভনাই কথা বললেন,

—আমার মেয়ে হসপিটালে পুলিশের কাছে স্টেটমেন্টে কালপ্রিটদের নাম বলেছে।

রমেনবাবু পিঠ টান করলেন—তাই নাকি? কারা তারা?

—কাজল দত্ত, পিঙ্কা আর সুজয়। দুটো ছেলে কাজল দত্তরই বন্ধু।

ভদ্রলোক মুহূর্তের জন্য চুপ থেকেই বলে উঠলেন,

—পুলিশ তাদের অ্যারেস্ট করেছে তো?

অনুতোষ কথা বললেন এতক্ষনে—না। করেনি। সেই জন্যই আপনার কাছে আসা। কাজল দত্ত এঁদের বাড়িতে এসে শাসিয়ে গেছে। প্রাণের ভয় পর্যন্ত দেখিয়েছে।

—আপনারা পুলিশকে সে কথা জানিয়েছেন?

প্রিয়ব্রত কথা বলার সাহস পেলেন এবার,

—জানিয়েছিলাম। তারা বলল আমার মেয়ে নাকি সঠিকভাবে নাম বলতে পারেনি। মিছিমিছি গুন্ডাদের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করতে গেলে নিজেদেরই...

—তাছাড়া কাজল দত্ত যে এঁদের ভয় দেখিয়েছে পুলিশের মতে তার তো কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। রেকর্ড নেই। অনুতোষ প্রিয়ব্রতর কথা কেড়ে নিয়ে নিজেই গুছিয়ে বলার চেষ্টা করলেন—আসলে ওরা যে কোনও কারণেই হোক স্টেপ নিতে চাইছে না। কাজল দত্তর নাকি পলিটিকাল ইনভলভ্‌মেন্ট...

—সে কি? গুন্ডাদের সঙ্গে পলিটিক্সের কি সম্পর্ক? রমেনবাবু হঠাৎই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন—এ সব কি কথা? পুলিশের তো তাদের ইমিডিয়েটলি অ্যারেস্ট করা উচিত ছিল...যত সব লুম্পেন্ বদমাইশ...দাঁড়ান দেখছি। এক সেকেন্ড বসুন তো।

অনুতোষ প্রিয়ব্রতর মুখের দিকে তাকালেন। প্রিয়ব্রত শোভনার দিকে। পাশের ঘর থেকে রমেনবাবুর উত্তেজিত গলা শোনা যাচ্ছে। বেশ জোরে কথা বলছেন ফোনে। ও সি-র সঙ্গে।

—না না...আমার পার্টিরছেলে ফেলে না...মেয়েটির বাবা মা আমার কাছে এসেছেন...হ্যাঁ। আপনি এক্ষুনি অ্যারেস্ট করুন।...

—হ্যাঁ হ্যাঁ। বলছি তো। অ্যারেস্ট করুন।...না আমি চিনি না। ওরকম ইলেকশনের সময় কত এলিমেন্টই তো ভেড়ে...

—এভাবেই আপনারা আমাদের বদনাম করে দিচ্ছেন। আমাদের পার্টির একটা ইমেজ আছে ..বলতে বলতে গলা আস্তে হয়ে গেল। আর কথা শোনা যাচ্ছে না। একেবারে শেষটুকু শুধু কানে এল,

—ইমিডিয়েটলি। ইমিডিয়েটলি। এ ব্যাপারে আমি আর আপনাদের ডি এম

বা এস পি-কে ফোন করতে চাই না।

ফোন রেখে রমেন ফিরে এলেন। চেয়ারে বসলেন আয়েস করে—বলে দিয়েছি। আর চিন্তা করবেন না। আপনাদের প্রোটেকশনের ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। ভয় পাবেন না। ...আসলে ব্রিটিশ আমল থেকে পুলিশে এমন একটা সিস্টেম চলে আসছে...তার পরিণতি আজ এই করাপশন। নোংরামির চূড়ান্ত। ঘাড় চেপে না ধরলে কাজ করতে চায় না। তার ওপর এই সব লুম্পেনদের সঙ্গে মাখামাখি...আমরা কত ভিজিলেন্স রাখব বলুন? ...কতটা আর দূর করতে পারি!

প্রিয়ব্রতর বুক থেকে হাজারমনি বোঝা নেমে গেল যেন। অনুতোষেরও মুখ উজ্জ্বল। রমেন সিংহর মধ্যে তাহলে এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে! সবটুকু বিকিয়ে যায়নি! বিবেক। ন্যায়বোধ। অথচ কাজলরা এঁকে খুঁটি করেই...!

অনুতোষ বলেই ফেললেন,

—-আমি জানতাম আপনার কাছে এলে কাজ হবেই। ওরা মিছিমিছি আপনার নাম দিয়ে...

—আপনারাই দেখুন। রমেনবাবু আরেকটা সিগারেট ধরালেন,

—আমাদের পেছনে সবাই উঠে পড়ে লেগেছে বুঝলেন। পুলিশ। আমলা। অপোজিশনের কথা বাদই দিলাম। তাদের তো কোন ক্যারেকটারই নেই। কি করেছি কেউ দেখে না। কি করিনি...

দিব্যি মেজাজে বক্তৃতা শুরু করেছেন ভদ্রলোক, শোভনা ফস করে বলে উঠলেন,

—তাহলে আপনি বলছেন ওরা অ্যারেস্ট হবেই? পুলিশ ধরবে?

—অফ কোর্স ধরবে। চাকরির ভয় নেই?

শোভনার তবু শংকা যায় না—আমার ছেলের কোনও বিপদ হবে না তো? একেবারেই বাচ্চা...

—কিছু হবে না। আপনি এত উতলা হচ্ছেন কেন? আমি তো রয়েছি। আপনারা আমাকে নির্বাচিত করেছেন। আমি আপনাদের দেখাশুনো করব না? নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি যান। মেয়েটাকে আগে স্বাভাবিক করে তোলা দরকার।

আরেকবার ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনজন বাইরে বেরিয়ে এলেন। বারান্দা থেকে নামার পর ছোট্ট একটু খোয়া বাঁধানো রাস্তা। তারপরে গেট। মাথার ওপর দিয়ে দুটো টুনটুনি উড়ে গেল। এখনও এদিকে নানারকম পাখি দেখা যায়। অনুতোষ বোগেনভিলিয়া গাছটার সামনে এসে সিগারেট দিলেন। প্রিয়ব্রতকে। শোভনা এগিয়ে গেলেন।

—নিন। মন হাল্কা করে টান দিন এবার।

প্রিয়ব্রতর মুখে স্বস্তির হাসি—এভাবে কাজ হয়ে যাবে ভাবিনি। কাজল যার জোরে এত মস্তানি করে বেড়ায়...

—ফুঁকো মস্তানি সব। রমেনবাবুরা ওদের কেন প্রোটেকশন দেবেন? বলেই গলা উঠিয়েছেন। শোভনাকে ডাকছেন।

শোভনা গেট পেরিয়ে ঘুরে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল স্রোত নেমে গেল। রমেনবাবুর দোতলার জানলা থেকে কে সরে গেল টুক করে! শোভনা পাথর হয়ে গেলেন। মুহূর্তের জন্য দেখলেও চিনতে ভুল হয়নি।

কাজল!

৫ই মে বেলা সাড়ে দশটা

রিক্সা থেকে নেমে সোজা ডি এম-এর ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন অনুতোষ। আর্দালি দরজা আটকে দাঁড়াল,

—কোথায়...

অনুতোষ কটমট করে তাকালেন—ভেতরে।

—এভাবে ঢুকবেন না। পাশের ঘরে পি এ-কে গিয়ে স্লিপ দিন আগে।

—হেল উইথ ইওর স্লিপ। অনুতোষ ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন লোকটাকে। সজোরে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেই ফেটে পড়েছেন,

—কি ভেবেছেন আপনারা আমাদের অ্যাঁ? পাঁঠা? ছাগল? অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালাচ্ছেন? হেড অফ ডিস্ট্রিক্ট? ফুঃ।

ডি এম উঠে দাঁড়ালেন। বয়স বেশি নয়। ত্রিশের একটু ওপরে হবে হয়ত। ঝকঝকে সুন্দর চেহারা। মুখ চোখে আলগা একটা আভিজাত্যের ছাপ। উঠে দাঁড়িয়ে অবাক মুখে তাকিয়েছেন,

—কি ব্যাপার? কে আপনি? এভাবে ঢুকে পড়েছেন কেন?

আর্দালি ছাড়াও আরও দু-তিনজন ভেতরে এসে চেপে ধরল অনুতোষকে,

—বাইরে, চলুন। চলুন।

—কিছুতেই যাব না। যা বলবার বলব, তারপরে যাব। অনুতোষ প্রাণপণে লোকগুলোর কাছ থেকে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করে চলেছেন—গায়ে হাত দেবেন না। আমি এখানে ভিক্ষে করতে আসিনি। চুরিও না।

তরুণ ডি এম সামনে এগিয়ে গেলেন। অনুতোষের চেহারা দেখে থতমত খেয়েছেন সামান্য।

—কে আপনি? কোথ্থেকে আসছেন?

—আই অ্যাম স্কুল টিচার। আমি এখনই আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। ইয়েস্। এখনই।

—ঠিক আছে। আপনারা যান। ডি এম লোকগুলোকে বাইরে যেতে বললেন। অনুতোষকে বসতে বললেন চেয়ার দেখিয়ে,

—বসুন। প্লিজ।

—আমি বসতে আসি নি।

—ও কে। কুল ডাউন দেন। এত এক্সসাইটেড থাকলে আপনি কথা বলবেন কিভাবে?

অনুতোষ নিশ্বাস ফেললেন জোরে জোরে। ট্রেন থেকে নেমে প্রচণ্ড রোদে হেঁটে এসেছেন। ঠাণ্ডা ঘরে ঢুকেও সেই উত্তাপ জড়িয়ে আছে গায়ে। মাথার পেছনে। শিরা দপদপ করে চলেছে একভাবে। ঘামে ভিজে পাতলা পাঞ্জাবি লেপটে গেছে শরীরে।

ডি এম বেল বাজিয়ে এক গ্লাস জল দিতে বললেন। দাঁতে দাঁত চেপে রাগটাকে সংযত করার চেষ্টা করলেন অনুতোষ। চেয়ার টেনে বসলেন সোজা হয়ে।

—বলুন এবারে।

—আপনারই জুরিসডিকশনের মধ্যে তিনটে গুন্ডা একটি মেয়েকে বীভৎসভাবে রেপ করেছে। ডু ইউ নো দ্যাট্?

ডি এম চমকে উঠলেন,—কোথায়? কবে? কোন জায়গায়?

—দেখুন, আপনিই খবর রাখেন না। অথচ এই ডিস্ট্রিক্টের ল অ্যান্ড অর্ডার দেখার কথা আপনারই।

ডি এম আবার বেল্ বাজালেন—দাসবাবুকে ডাকো।

অনুতোষ হাত নাড়লেন—ডেকে লাভ নেই। বুঝতে পারছি ওটা আপনার রেকর্ডেই আসেনি এখনও। টোটাল সাপ্রেশন অফ...

—আই অ্যাম সরি। ডি এম এবার বেশ বিব্রত হয়েছেন— আপনি খুলে বলুন আমাকে। বাই দি বাই, মেয়েটি আপনারই?

—না। আমার প্রতিবেশীর। তবে যে কোনও দিন আমার মেয়েও ভিক্টিম হতে পারে।

—আপনি সত্যি খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। তরুণ ডি এম আলগা হাসলেন—আমাকে না জানানো হলে আমি জানব কি করে?

—রামনগরের নাম শুনেছেন?

—সিওর।

—ত্রিশ তারিখ বৃষ্টি আর অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে রামনগরের তিনজন

অ্যান্টিসোশাল জানোয়ার মেয়েটাকে...মেয়েটা টিউশনি করে ফিরছিল। ভদ্রঘরের, ভাল মেয়ে।

—আচ্ছা, আচ্ছা। ডি এম আঙুল তুললেন,—এরকম একটা খবর এসেছিল বটে। রামনগর। রাইট। কিন্তু মেয়েটা তো কারুর নাম বলতে পারে নি। এখনও ইন্‌ভেস্টিগেশন চলছে।

—বাজে কথা। রামনগর থানার ও সি-কে প্রত্যেকটি গুন্ডার নাম সে জানিয়েছিল। তারা কোনও স্টেপ নেয় নি। শুধু তাই নয়, পুলিশকে মেয়েটি নাম জানানোর পরই সেই গুন্ডাদের কাছে আপনাদেরই পুলিশ খবর পৌঁছে দেয়। তারা এসে মেয়েটির বাড়িতে...

—আপনি কালপ্রিটদের নাম জানেন?

—জানি। অনুতোষ আলগা মাথা দোলালেন—আপনি তাদের ধরতে পারবেন না। সে ক্ষমতা আপনাদের নেই।

—হু আর দে?

—তারা আপনাদের শ্রদ্ধেয় নেতা রমেন সিংহর ঘরের পোষা কুকুর। আমরা নিজের চোখে তাদের একজনকে রমেনবাবুর শেল্টারে দেখে এসেছি। অনুতোষ দুটো মাত্র বাক্য বলে হাঁপাতে লাগলেন। শোভনার অসহায় মুখটা চোখের ওপর ভাসছে। কোনরকমে দুজনকে রিক্সায় তুলে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তারপর সোজা ট্রেন ধরে..

ডি এম ফোন তুললেন--এস পি কে দিন।

অনুতোষ বুড়ো আঙুল ওঠালেন, —পাবেন না। আমি ওই অফিস ঘুরেই আসছি। উনি কলকাতা গেছেন।

ডি এম তবু ফোনটাকে ধরে কটকট করলেন কয়েকবার। রেখে দিলেন,—ঠিক আছে। আমি দেখছি।

অনুতোষ উঠে পড়লেন, —একটা কথা বলব?

--বলুন।

—আপনার বয়স কত?

—কেন?

--আপনার থেকে বয়সে আমি অনেক বড়। কয়েক বছরের মধ্যেই রিটায়ার করব। বহুকাল শিক্ষকতা করেছি। আপনার বয়সী অনেক ছাত্রও আছে আমার। আমি আপনাকে অ্যাডভাইস্ করছি এ চাকরি ছেড়ে দিন। বলতে বলতে হনহন করে চলে গেলেন দরজার দিকে। দরজা খুলতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়িয়েছেন—কত দূর কি করতে পারবেন জানি না। বাট আই উইল গো টু দা লাস্ট্। চুপ করে বসে থাকব না। আর এর মধ্যে যদি বাড়াবাড়ি কিছু হয়ে যায়, আপনারা

একজনও কিন্তু স্পেয়ারড হবেন না। কথাটা এখখুনি ফোন করে জানিয়ে দিতে পারেন আপনাদের নেতাকে।

ঘর থেকে প্যাসেজ, প্যাসেজ থেকে সোজা রাস্তায় আসার পর দম ছাড়লেন অনুতোষ। শরীর ভেঙে আসছে। আর হাঁটার ক্ষমতা নেই। রিক্সা ডাকলেন।

হু হু করে ছুটে চলেছে রিক্সা। অনুতোষ বহুক্ষণ পর তাকালেন রাস্তার দিকে। একদল ফুলের মত শিশু মায়েদের হাত ধরে ফিরছে নার্সারি থেকে। ডিস্ট্রিক্ট কলেজের ছেলেমেয়েরা চলেছে কলকল করতে করতে। আগামী দিনের ভবিষ্যত। এদের মধ্যে থেকেই কেউ হয়ত কাজল হয়ে যাবে। অনুতোষের বুকের বাঁ দিকটা চিনচিন করে উঠল। তবে কি তাঁদেরই ফাঁকি রয়ে গেছে কোথাও? কোথাও দায়িত্ব পালনের অবহেলা? বিপিনবাবুর ছেলেটাও তো এককালে তাঁর কাছে পড়েছে। কি শিক্ষা দিতে পেরেছেন তিনি? কোন্ শিক্ষার ভিত গড়ছেন তাঁরা? নাহ্। ভুল ভাবছেন। শুধু কাজলকে দোষ দিয়ে কি লাভ? পরিবেশ... পরিজন...লোভ...হিংসা...। কাজলরা তো শুধুই শিকার। এই দুর্গন্ধময় ঘুণধরা সমাজব্যবস্থার। এই স্বার্থসর্বস্ব সময়টার। অনুতোষ বিড়বিড় করে উঠলেন,

...মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা/শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।...

কত দিন আগে লেখা কবিতা। জীবনানন্দের। তবু প্রতিটি ছত্র এই মুহূর্তেও কী ভীষণ সত্য।

...যাদের হৃদয়ে কোনও প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই...

উফ্। অনুতোষ এক হাতে বুক খামচে ধরলেন। হৃৎপিণ্ডটাকে যদি বার করে হাতের মুঠোয় চেপে ধরা যেত!

রিক্সা থেকে নেমে টলতে টলতে প্ল্যাটফর্মে উঠলেন। টিকিট কেটে দাঁড়িয়ে আছেন ট্রেনের জন্য। সবুজ সিগনাল হল। ট্রেন আসছে।

...অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ/যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা;...

ট্রেনে উঠতে যাবেন তখনই মাথার পেছনে আছড়ে পড়েছে আঘাত। প্ল্যাটফর্মে লুটিয়ে পড়লেন মুহূর্তে। পৃথিবী দুলে উঠল ভূমিকম্পের মত। অন্ধকারে ডুবে যেতে যেতেও হৈ হট্টগোল শুনতে পাচ্ছেন। কারা যেন ছুটে পালাচ্ছে। কারা যেন ধরে তুলছে তাঁকে।

—ওই যে পালাচ্ছে...ওই ছেলেগুলো...

—কি হয়েছে মশাই? কি হয়েছে?

—আরে কতগুলো ছেলে ভদ্রলোকের মাথায় দুম করে একটা রডের বাড়ি মেরেই পালাল। ...ইস্। কতটা মাথা কেটে গেছে!

—ধর ধর। ওই যে। ওই তো সামনের কামরায় উঠে গেল।

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। রওনা দিল রামনগরের দিকে। অনুতোষ ঝাপসাভাবে টের পেলেন তাঁকে ধরাধরি করে প্ল্যাটফর্মের সিটে শুইয়ে দেওয়া হল। সিটের কোলে ধীরে ধীরে শরীরটাকে পুরো ছেড়ে দিলেন অনুতোষ।

৬ই মে ভোররাত্রি

এই শব্দটুকু শোনার জন্য এতক্ষণ কান পেতে ছিল বাবলু। নোটন ভানুদের বলা আছে একদম যেন জোরে আওয়াজ না করে। বিছানায় বসে বাবলু একটুখানি দেখে নিল বাবাকে। ঘুমোচ্ছে। কাল অনেক রাত অবধি অনুতোষকাকার কাছে ছিল বাবা মা দুজনেই। বাড়ি এসেও জেগে বসেছিল অনেকক্ষণ। দুটোর পর শুয়েছে। মাথায় বেশ কয়েকটা সেলাই পড়েছে অনুতোষ কাকার। বাবলুর শরীর শক্ত হয়ে গেল। আরেকবার বাবাকে দেখে নিয়ে সাবধানে নেমে এল খাট থেকে।

জানলার বাইরে থেকে ল্যাম্পপোস্টের আলো এসে ঘরের ভেতর হালকা একটা আলোর আবেশ ছড়িয়ে রেখেছে। স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করা যায় এ আলোতে। পা টিপে বাবলু ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মুখোমুখি ঘরের দরজায়, পর্দার এপারে, নিথর দাঁড়িয়ে দিদি। দেখে মনে হয় অনন্তকাল ধরে এভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। বাবলু কাছে গিয়ে দিদির কাঁধে হাত রাখল। নিঃশব্দে উচ্চারণ করল, —আয়।

বাবলুকে অনুসরণ করে সুতপাও এল বাইরের ঘরে। ভাইকে দরজা খুলে দিল,

—তোরা না ফেরা অবধি আমি কিন্তু খুব চিন্তায় থাকব।

বাবলু ফিসফিস করল—ভাবিস্ না। আমরা অনেকে আছি।

নোটন ভানু রাস্তার এক পাশে অন্ধকারটুকুতে দাঁড়িয়ে আছে। বাবলু কাছে গেল,

—দাঁড়া। ঝর্ণাদিও কিছু তৈরি করে রেখেছে।

ভানু বলল—আমি নিয়ে নিয়েছি আগেই। ওই তো দ্যাখ্ না ঝর্ণাদি দাঁড়িয়ে জানলায়।

—অনুতোষ স্যার এখন কেমন আছেন রে?

—জ্বর এসেছে। ভুল বকছেন মাঝে মাঝে।

নোটন তাড়া দিল—তাড়াতাড়ি আয়। মোড়ে অপেক্ষা করছে সবাই। আলো পুরো ফোটার আগেই কাজ সেরে ফেলতে হবে।

বাবলু আকাশের দিকে তাকাল। গাঢ় নীল আকাশে এখনও রাত লেগে আছে। ফটফট করছে তারারা। হাল্কা বাতাস বইছে। ঠাণ্ডা হয়ে আছে চারদিক। এরকম সময়ে পৃথিবীকে খুব ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

হাঁটতে হাঁটতে নোটন জিজ্ঞাসা করল—হ্যাঁরে তপুদির মত নিয়ে নিয়েছিস তো? তপুদির আপত্তি নেই?

—নারে বাবা না। বাবলু হাত রাখল নোটনের পিঠে—আমার দিদিকে তোরা চিনিস না। একদম অন্যরকম। সব্বার থেকে আলাদা। বলেই ছোট্ট চাপড় মেরেছে নোটনের কাঁধে, —কি বলেছে জানিস?

—কি?

—আশ্চর্য একটা কথা। বলল, প্রথম প্রথম খুব কষ্ট পেয়েছি রে বাবলু। লজ্জা লেগেছে। পরে ভেবে দেখলাম, ওই সব গুন্ডাদের যে কোনও অত্যাচারই তো সমান অপরাধ। তা সে রেপিং হোক, কি খুন কিম্বা বুকে ছুরি মারা। তাতে আমি লজ্জা পাব কেন?

ভানু কৃষ্ণচুড়া গাছের কাছে পৌঁছে গেছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে তাড়া লাগাল—কিরে, পা চালাবি তো?

বাবলু ভানুকে ধরে ফেলল—অমিত, শুভ, পিকলু সবাইকে খবর দিয়েছিলি? আসবে সবাই?

—আয় না। দেখবি কতজনকে জোগাড় করে ফেলেছি।

সত্যিই অনেককে জোগাড় করেছে ভানু। বড় রাস্তায় এসে বাবলুর প্রায় চক্ষুস্থির। সেজদার দোকানের সামনে, শনি মন্দিরের পাশে, পানের দোকানের গায়ে জড়ো হয়ে গেছে সবাই। পাড়ার। বেপাড়ারও।

অনেক চিন্তা করে এই সময়টাকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। বুদ্ধিটা নোটনের। শেষ রাতের ঠিক এই সময়টাতেই গৃহস্থের ঘুম গাঢ় হয়। গুন্ডা বদমাইশরা পথে থাকে না। পুলিশও বিশ্রাম নেয়। কুকুরের ডাকও শোনা যায় না তেমন। গোটা রামনগরের দেওয়ালে পোস্টার দিয়ে আগুন ধরাতে গেলে এই সময়টার কোন জুড়ি নেই।

একটুও সময় নষ্ট করল না কেউ। সাইকেল নিয়ে দুজন দুজন করে ছড়িয়ে গেল। পুবে। পশ্চিমে। উত্তরে। দক্ষিণে। সাইকেলের হ্যান্ডেলে আঠার বালতি। কেরিয়ারে পোস্টারের তাড়া। বিভিন্ন হাতে লেখা।

দেখতে দেখতে রামনগরের দেওয়াল লাল হয়ে উঠল। আকাশ লাল হওয়ার

আগেই। ছেলেরা যে যার মত কাজ সেরে ফিরে গেল।

আবার সব সুনশান। নিস্তব্ধ। একমাত্র রামনগরের দেওয়ালগুলো জেগে উঠেছে। লাল কালিতে লেখা অসংখ্য পোস্টার বুকে নিয়ে গর্জন করছে—

সুতপা বসুর ধর্ষণকারী কাজল, পিঙ্কা, সুজয়কে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে।

কাজল দত্ত এম এল এ-র বাড়িতে আছে। পুলিশ জানে।

৬ই মে সকাল সাড়ে দশটা

ঠিক এই ধরনের প্রতিক্রিয়ার জন্য বাবলু বা সুতপা কেউই প্রস্তুত ছিল না। প্রিয়ব্রত বা শোভনা তো ননই। অনুতোষ সুরমাও নন। পাড়ার কেউই নয়।

বাইরে অবিরাম হট্টগোল চলছে। প্রায় আধঘণ্টা ধরে। দেওয়াল থেকে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরছে সমবেত চিৎকার। বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে গেছে জনা পঁচিশেক লোক। সরু রাস্তায় ধাক্কাধাক্কি। ঠেলাঠেলি। একটা লোকও আর বাড়ির থেকে বেরোতে পারছে না। সুতপাদের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মধ্যবয়সী একজন গলা ফাটিয়ে শ্লোগান দেয়, পরমুহূর্তে শেষ শব্দগুলোকে নিয়ে ঝংকার তোলে বাকিরা—সুতপা দত্তর ধর্ষণকারী কাজল দত্তর শাস্তি চাই। ...শাস্তি চাই। শাস্তি চাই। ...রমেন দত্তর পোষা কুত্তা কাজল দত্ত কোথায় গেল, রমেন তুমি জবাব দাও। ...জবাব চাই। জবাব দাও। .. মা-বোনেদের ইজ্জত নিয়ে রমেন তোমার নোংরা খেলা বন্ধ করো। ...বন্ধ করো। বন্ধ করো। ...সুতপা তুমি ভয় পেও না, আমরা তোমার সঙ্গে আছি।

কারা এরা! কোথ্‌থেকে এল!

ভিড়টা যখন প্রথম জমতে শুরু হয়, তখনই হুড়মুড় করে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন প্রিয়ব্রত। একজনকেও চিনতে পারেননি। মধ্যবয়সী লোকটি তাঁকে দেখতে পেয়েই এগিয়ে এসেছিল,

—কোনও চিন্তা নেই দাদা। আমরা এসে গেছি।

একটি ছেলে বলে উঠেছিল—রমেন সিংহর মুখোশ আজই ছিঁড়ে দিচ্ছি আমরা।

আরেকজন বলেছিল—রাস্তায় রাস্তায় প্রতিরোধ গড়ে তুলব। থানা ঘেরাও কবব। রমেন সিংহর বাড়ি থেকে আজই টেনে বার করব শুয়োরের বাচ্চাটাকে।

প্রিয়ব্রত হতভম্ব। কথাবার্তা শুনে বোঝাই যায় এরা সব বিপক্ষের লোক। কোন্ দল! বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী! নাকি বিপরীত পার্টি! অন্য রঙের! মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা

করতে পারেন নি। যে হোক, যারাই হোক তবু তো এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। নতুন করে বল ফিরে পেয়েছিলেন যেন। জনরোষ প্রবল হলে কতক্ষণ কাজলকে আশ্রয় দিতে পারবেন রমেনবাবু? কিম্বা পুলিশ? ভয় মুছে তবে কি আশার আলো ফুটছে! অনুতোষও জ্বর গায়ে বেরিয়ে এসেছিলেন রাস্তায়। আর সব প্রতিবেশিরা অবশ্য আতঙ্কে ঢুকে গেছেন যে যাঁর খোলসের মধ্যে। জানলা দিয়ে উঁকি দিচ্ছেন শুধু। কে বলতে পারে কখন কি হয়ে যায়!

সকালে প্রথম ঘোষবাবু বাজার থেকে ফিরে খবরটা দেন প্রিয়ব্রতকে। তখন বোধহয় সাড়ে ছটাও বাজে নি,

—কী কাণ্ড মশাই! গোটা রামনগর তো একেবারে পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেছে!

—কিসের পোস্টারে!

—জানেন না! আপনার মেয়েকে নিয়ে। বলতে বলতে কৌতূহলী হয়েছেন আরও—সত্যি নাকি! কাজলরা রেপ করেছিল তপুকে! মানে বিপিনবাবুর ছেলেটা!

প্রিয়ব্রত বিস্ময়ে হতবাক।

—আরও মারাত্মক পোস্টার পড়েছে। পুলিশের নামে। রমেন সিংহর নামে।

প্রিয়ব্রত পড়িমরি করে ছুটেছিলেন অনুতোষের কাছে,

—এসব কাদের কাজ বলুন তো? কি শুনছি?

অনুতোষও চিন্তিত বেশ—আমিও শুনেছি। আপনার কি মনে হয়? কারা করেছে?

—বুঝতে পারছি না। কি হবে?

—ঘাবড়াচ্ছেন কেন? ভালই তো হয়েছে।

তবে কি এই লোকগুলোই পোস্টার ছড়িয়েছে। খবর পেল কোথ্থেকে! উত্তরোত্তর চিৎকার বেড়েই চলেছে। বাড়ছে। কমছে। থামছে। মাঝে মাঝে কান ঝালাপালা হওয়ার জোগাড়। অনেক তো হল। এবার এরাও কিছু করুক। প্রিয়ব্রত ভেতরে এলেন। শোভনা খাবার জায়গায় বসে কুটনো কুটছেন। প্রথমটা প্রিয়ব্রতর মত চমকে উঠেছিলেন তিনিও। এখন মুখ গম্ভীর। কাল থেকেই কথা বলছেন না ভাল করে। থম মেরে আছেন।

প্রিয়ব্রত জিজ্ঞাসা করলেন—ছেলেমেয়েরা কোথায়?

শোভনার হয়ে উত্তর দিল ঠিকে ঝি—ওই তো ও ঘরে। ঝর্ণাদিদির সঙ্গে কথা বলছে।

প্রিয়ব্রত শোবার ঘরে ঢুকলেন। শোবার ঘর থেকে বাইরের ঘরে গেলেন।

আবার ভেতরে এলেন। কি করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। কখনও ভয়। কখনও যন্ত্রণা। কখনও আশা। কখনও সংশয়। এ এক অদ্ভুত জটিল পরিস্থিতি। পাখার সুইচটাকে নেভালেন। জ্বালালেন। লোডশেডিং চলছে সেই সকাল থেকেই। কখন যে একটু বাতাস পাবেন কে জানে!

বাইরের কোলাহল হঠাৎই যেন থমকেছে একটু। প্রিয়ব্রত জানলায় এলেন। আরেক ঝাঁক শব্দের ঝাপটা এসে লাগল কানে। শনি মন্দিরের দিক থেকে। আরেক দল আসছে বোধহয়। প্রথমে ফিকে। তারপর ধীরে ধীরে আওয়াজ স্পষ্ট হল। সামনের লোকগুলো সব স্থির তাকিয়ে ডানদিকে। ক্রমে আরও কাছে এল। অনুতোষদের বাড়ির সামনে এসে পড়েছে দ্বিতীয় দল। ভয়ঙ্কর চিৎকার তুলে গর্জে উঠল—

...চক্রান্তকারীদের কালো হাত ভেঙে দাও। গুঁড়িয়ে দাও। ...রমেন সিংহর নামে কুৎসা রটিয়ে ফায়দা লোটা যায় না। যাবে না।...

প্রিয়ব্রতর নিঃশ্বাস আটকে গেল। দ্বিতীয় দলটাকে নেতৃত্ব দিচ্ছে রমেনবাবুর বাড়ির কালকের সেই লোকটা। জানলা থেকে দ্রুত সরে গেলেন। দৌড়ে ঢুকে গেছেন ভেতরের দিকে,

—তাড়াতাড়ি সব জানলা বন্ধ করে দাও। শীগ্‌গীরই।

প্রিয়ব্রতর মুখ কাগজের মত সাদা। শোভনা অপ্রতিভ—কি হয়েছে?

—ওরা এসে গেছে।

—কারা?

—রমেনবাবুর লোকরা। শুনতে পাচ্ছ না? চিৎকার করছে?

কথা না বলে শোভনা আগে ছেলেমেয়ের ঘরে গেলেন। খাটের ওপর তপু, ঝর্ণা, বাবলু তিনজনই কাঠ হয়ে বসে। জানলা তিনটে লাগিয়ে ছিটকিনি তুলে দিলেন ভাল করে,

—কেউ একদম ঘর থেকে বেরোবে না?

ঝর্ণার গলা ছলছল করে উঠল—কি হবে কাকিমা?

—ভয় কিসের? আমরা তো আছি।

দু তরফ থেকেই স্লোগান ছোড়া শুরু হয়েছে এবার। অশ্রাব্য গালিগালাজ চলছে। এই বুঝি মারপিট লেগে যায়। বন্ধ জানলায় কান রেখে কিছুক্ষণ দু পক্ষের কথাই শোনার চেষ্টা করলেন শোভনা। আপনাআপনি মুখ হাঁ হয়ে গেছে,

—ওরাও তো একই কথা বলছে!

—কারা?

—রমেনবাবুর দল! শোন ভাল করে।

প্রিয়ব্রত মাথার বিভ্রান্ত ভাব কমল। সত্যি তো। দু দলই আগে পরে স্লোগান দিচ্ছে ...সুতপা তুমি ভয় পেও না, আমরা তোমার সঙ্গে আছি। দু পক্ষেরই বক্তব্য মিলেমিশে এক। এর মধ্যেই গাড়ির শব্দ শোনা গেল একটা। ঘোষবাবুদের বাড়ির সামনেই বোধহয় কেউ নামল গাড়ি থেকে। গোলমাল আরও উত্তাল হল।

...দুশমনকে চিনে নিন। এই মাটিতে কবর দিন।

দুমদুম ঘা পড়ল দরজায়। সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজ।

শোভনা প্রিয়ব্রতর হাত খামচে ধরলেন, —খবরদার খুলো না। যা হয় হবে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো।

প্রিয়ব্রতর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

উৎকট আওয়াজ তুলে কড়া নড়েই চলেছে,

—প্রিয়ব্রতবাবু, দরজা খুলুন। কোন ভয় নেই। রমেনদা এসেছেন।

শোভনা প্রিয়ব্রত কি করবেন বোঝার আগে আচমকা সুতপা এসে দরজা খুলে দিয়েছে। বাইরের উন্মত্ত আওয়াজ সঙ্গে সঙ্গে আছড়ে পড়েছে গোটা ঘরে। আওয়াজের পেছনে সৌম্যকান্তি রমেন সিংহ। চকিতে একবার সকলকে দেখে নিয়ে নিজেই গিয়ে সোফায় বসে পড়েছেন,

—ছি ছি ছি। একটা মেয়ের মান ইজ্জত নিয়ে কী জঘন্য পলিটিক্স শুরু হয়ে গেছে দেখেছেন? বলেই চ্যালাদের দিকে তাকিয়েছেন—আঃ। চেঁচামেচি বন্ধ কর। বন্ধ করতে বল। ওরা পাঁকে নামলে তোদেরও নামতে হবে? আমাদের পার্টির একটা আলাদা ডিসিপ্লিন আছে। দরজাটা বন্ধ করে দে।

কথা মুখ থেকে খসতে না খসতে কালকের মোসাহেব ছিটকিনি তুলে দিয়েছে। রমেনবাবুর মুখ ঘুরেছে সুতপার দিকে,

—তুমিই সুতপা?

সুতপার চোখ দপদপ করে উঠল।

—এসো মা। কাছে এসো। কোনও ভয় নেই। বিধায়কের মুখে অভয় হাসি।

সুতপা স্থির। দুর্বল শরীরটাকে ঠেকিয়ে রেখেছে দেওয়ালে। জ্বলন্ত চোখে ক্রমে নেমে আসছে শীতলতা। কঠিন। শান্ত। এ চোখে চোখ রাখা সহজ নয়।

রমেনবাবুও রাখতে পারলেন না। বিব্রত চোখ শোভনার দিকে ফিরিয়ে নিয়েছেন,

—আসলে দিদি ব্যাপারটা কি হয়েছে জানেন তো। কাজল বরাবরই ওদের পার্টির ছেলে। গুন্ডা। রাফিয়ান। তা ইলেকশনের আগে হঠাৎ আমার কাছে এসে উপস্থিত। বলে, স্যার আপনার কাছে কাজ করতে চাই। আমি মাস্তানি ফাস্তানি ছেড়ে দিয়েছি। ভাবলাম হয়ত ছেলেটা ভাল হতে চায়। ঠিক আছে করবি কাজ

কর। একটা ছেলে ভাল হতে চাইলে তাকে ফেরানো যায় বলুন?

ঘরের সবাই চুপ। রমেনবাবু থামলেন। সকলেই শুনছে তাঁর কথা। শুনছেই শুধু। কোনও দাগ কাটছে কি না বুঝতে পারলেন না বিধায়ক। গলা ঝেড়ে নতুন করে কথা শুরু করলেন। হাসি ফোটালেন জোর করে,

—রত্নাকরও বাল্মীকি হয়েছিলেন। ঠিক কি না? তাছাড়া কাজলের বাবা একজন সাচ্চা বিপ্লবী ছিলেন। আদর্শবাদী। তাঁর ছেলেকে শুধরোবার সুযোগ দেব না? ...কিন্তু গোটা ব্যাপারটাই ছিল আমার বিরুদ্ধে প্রিপ্ল্যানড্ কন্সপিরেসি। আমাকে ধ্বংস করার জন্য, আমার ইমেজ নষ্ট করার জন্য ওরা কাজলকে আমাদের পার্টিতে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। আমি অবশ্য বুঝতে পারার পরই ওকে পার্টি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

বলেই সঙ্গীদের দিকে তাকালেন,

—বল। তাড়িয়ে দিয়েছিলাম কি না বল। এপ্রিলের ফার্স্ট উইকে।

কালকের বক্তৃতাবাজ লোকটা গলা মেলাল,

—আসলে কি জানেন তো রমেনদা। কাজল ওদের কাছ থেকে ভাল মালকড়ি খেয়েছে। আসলে আপনি রামনগরের জন্য এত কাজ করছেন, আপনার একটা ইমেজ তৈরি হয়েছে...

লোকটার কথা শেষ হওয়ার আগেই রমেন সিংহর মাথার পাশে দাঁড়ানো গাঁট্টাগোট্টা লোকটার গলা গমগম করে উঠল,

—কাজলের কাজের জন্য রমেনদাকে এভাবে ...। ওদের পার্টির লোকগুলো শালা রামনগরের দেওয়াল নষ্ট করেছে। পোস্টার মারা! এ নোংরামির বদলা আমরা নেব শালা...

—আঃ রতন। কি হচ্ছেটা কি? রমেনবাবু ধমকে উঠেছেন সঙ্গে সঙ্গে। ঠিক যেমনভাবে ধমকে ওঠে বুলডগেব ট্রেনারবা! কুকুর চেন ছিঁড়ে বেরিয়ে গেলে। কথার অবাধ্য হলে।

শোভনা দাঁতে দাঁত চেপে প্রাণপণে সংযত করার চেষ্টা কবলেন নিজেকে। নাটকের দৃশ্যগুলো দেখে তাঁর বমি আসছে। বিপক্ষ দল এখনও সমানে স্লোগান দিয়ে চলেছে। বাইরে। একটা মেয়ের আত্মসম্মানকে দাবার ঘুঁটি করে চাল দিয়ে চলেছে দুই রাজনৈতিক দল। মেয়েটা যে একটা মানুষ, তাবও যে একটা অস্তিত্ব আছে, সামাজিক মর্যাদার প্রশ্ন আছে এ কথাটা ভুলে গেছে রাজনৈতিক দলগুলো। সুযোগ বুঝে চলছে এক অলিখিত জমি দখলের লড়াই। রাজনীতির জমি। ছিঃ।

চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে প্রিয়ব্রত, বাবলু, সুতপা। সকলকে এক ঝলক দেখে নিয়ে যথাসম্ভব গলাটাকে ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করলেন শোভনা।

—কিছু যদি মনে না করেন, আপনি এবারে আসুন। ওরাও বাইরে অপেক্ষা

করছে।

রমেনবাবু অবাক হয়েছেন খুব—ওঁরা? কারা?

শোভনার স্বর আরও শান্ত—বাইরে যারা স্লোগান দিচ্ছে। আপনার বিপক্ষ দল।

—ওরা আবার কি বলবে?

—বাহ্। আপনার নিন্দে করবে না। আপনি যেমন এতক্ষণ ওদের করলেন? আপনার কালো হাত ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে চাইবে। আমাদের তো সব শুনতে হবে। তাই না?

—আপনি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না?

শোভনার আর একটা কথাও বলার প্রবৃত্তি হল না।

৮ই মে বেলা এগারোটা

থানার কিছুটা আগে, জোড়া শিব মন্দিরের চত্বরে বসে ছিলেন ওঁরা। অনুতোষ প্রিয়ব্রত, শোভনা, সুরমা। চাপা উত্তেজনায় চারজনই হাঁপাচ্ছেন অল্প অল্প। অনুতোষের মাথায় বড় ব্যান্ডেজ। কালও ফাটা জায়গাটা দিয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে।

মেঘহীন আকাশ থেকে শেষ বৈশাখের ঝাঁঝালো রোদ নেমে এসে ছড়িয়ে পড়েছে দশদিকে। মন্দির চত্বর আগুন হয়ে উঠছে ক্রমশ। গরম বাতাসের হল্কা মাঝেমাঝেই এসে ঝাপটা মেরে যাচ্ছে শরীরে।

শোভনা একবার উঠে রাস্তাটা দেখে এলেন—আর কেউ মনে হয় আসবে না।

সুরমা ম্লান হাসলেন—কত রকম কাজ আছে সবার। অফিস! কাছারি! ঘর! সংসার!

অনুতোষের গলায় ঝাঁঝ ফুটল—কারুর আসার দরকার নেই। আমরাই যথেষ্ট। তেমন হলে আমরা চারজনই...

প্রিয়ব্রত শ্বাস ফেললেন, —কিছু হবে বলে কি মনে হয়?

—আলবৎ হবে। সমস্ত নিউজপেপারে খবর হয়ে গেছে। চাপা দেওয়ার রাস্তা কোথায়?

—আপনি তো সেদিন ডি এম-এর কাছে গিয়েছিলেন। তিনি তো সব জানেন। পিঙ্কা, সুজয়কে ধরা গেল, আর কাজলকে ধরা গেল না?

—কাজলকেও লুকিয়ে রাখা সহজ হবে না আর। বাবারও বাবা আছে। আজ এখানে কাজ না হলে আই জি-র কাছে যাব। রাইটার্স আছে। মিনিস্টাররা আছেন।

প্রিয়ব্রত হাত ওল্টালেন—পিঙ্কা, সুজয়কে ধরা তো সোজা। ওরা মাথা নয়, কোনও রাজনীতির খুঁটি নেই ওদের। পুলিশেরও ওদের ধরতে তাই অসুবিধে হয়নি। কিন্তু কাজল...প্রিয়ব্রত নিজের মনেই বলে চললেন, —আমার কিন্তু ভাল মনে হচ্ছে না। এস পি কোনও স্টেপ নিল না। ...রামনগরের হাওয়া কেমন গুমোট হয়ে গেছে...দুতরফই মনে হয় আস্তিনের নিচে ছুরিতে শান দিচ্ছে...। আপনি কি বলতে চান মিনিস্টাররা কেউ কিছুই জানেন না?

অনুতোষ এবার আর উত্তর করলেন না। হয়ত প্রিয়ব্রতই ঠিক। কিন্তু সাপের লেজে পা যখন পড়েছেই, সাপটার মোকাবিলা করতেই হবে। এত দূর এগোনোর পর এছাড়া বাঁচার পথ কোথায়? বাঁচলেও সে বাঁচার মূল্য কি?

শোভনা বললেন—আমার তো বেশি চিন্তা হচ্ছে ছেলেগুলোকে নিয়ে। আজ নয় কাল সবাই জানবে পোস্টারগুলো মেরেছিল কারা। তখন আবার নতুন করে না বিপদ আসে...

সুরমা বললেন—এরকম বিপদ যেন কারুরই না আসে সেজন্যই তো সবাইকে ডাকা। তপু কি শুধু আপনারই মেয়ে? প্রত্যেক বাড়িতে তপু নেই। বাবলু নেই? নোটন নেই? ভানু নেই? ভগবান না করুন কাল অন্য কোনও তপু যদি..

সুরমা কথা শেষ করলেন না। পরশু সন্ধে থেকে প্রতিটি দরজায় দরজায় ঘুরেছেন। সুভাষ পল্লীর। চৌধুরি বাগানের। পুরনো বাজারের। নতুন বাজারের...। নিজেব পাড়ারই কেউ সাড়া দিল না তেমনভাবে। ব্যানার্জি গিন্নী বললেন, সত্যিই যাওয়া উচিত। কিন্তু উনি কি পারবেন। ওনার অফিসে এখন যা ঝামেলা যাচ্ছে। তবু বলব। আর আমি তো হেঁসেল ঠেলে...দেখি...পারলে নিশ্চয়ই যাব। ব্যানার্জিবাবুর ছেলের বউটা সেই যে পর্দার কোন থেকে উঁকি মেরে পালাল আর বেরোলই না সুরমা থাকা পর্যন্ত...ঘোষবাবু সোজাসুজি বলে দিলেন, এসব নোংরা ব্যাপার নিয়ে বেশি ঘাঁটা ভাল না। যথেষ্ট তো হল। মিছিমিছি প্রিয়বাবুর মেয়ের বদনাম বাড়ছে...মণ্ডলগিন্নী মুখের ওপর বলে দিলেন, আমি তো আগেও বলেছি, সোমত্থ মেয়েব অত বাত অবধি বাইরে থাকা ঠিক না। কার দোষ বেশি কাব দোষ কম কে জানে .আর তপুর মীরাবৌদি তো সুরমাকে দেখে কেঁদেই সারা, আমার বাড়ির থেকে ফেরার পথে এমন ঘটনাটা ঘটল! আমি এখনও ভাবতে পারি না। বোজ ভাবি সুতপাকে দেখতে যাব। কিন্তু কি বলব ওকে নিয়ে ভাবতেই বুকটা ভয়ে সিঁটিয়ে যায়। থানায় যেতে বলছেন, সবাই গেলে. নিশ্চয়ই যাব। তবে ওকে একবার জিজ্ঞেস করে নিতে হবে...বুলা বলে বৌটাতো কথাই বলল না ভাল করে...অন্য পাড়ার মেয়ে বউরা রসিয়ে রসিয়ে জিজ্ঞেস করে সব। আসল কথা হ্যাঁ হুঁ করে এড়িয়ে যেতে চায়। ...কয়েকজন অবশ্য কথা

দিয়েছেন আসবেন। ...কজন যে শেষ পর্যন্ত আসবে!

সুরমা ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন, ঠিক তখনই অনুতোষ চমকে উঠে দাঁড়িয়েছেন। মন্থর পায়ে, লাঠি ঠুকতে ঠুকতে কুঁজো শরীরটাকে এদিকেই টেনে আনছেন বিপিনবাবু। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়েছেন শোভনা। প্রিয়ব্রত। সুরমা।. বিপিনবাবু তাঁদেরই সামনে এসে দাঁড়ালেন। লাঠিতে ভর দিয়ে প্রাণপণে সোজা থাকার চেষ্টা করছেন,

—এলাম। তোমরা থানায় যাবে না? কটায যাওয়ার কথা?

প্রিয়ব্রতর মুখ থেকে বিস্ময় ছিটকে এল--আপনি!

—হ্যাঁ আমি। কত দিন কোনও ভাল কাজ করিনি। মরবার আগে অন্তত একটা ভাল কাজও যদি...

চারজন পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন। কথা হারিয়ে যাচ্ছে।

বৃদ্ধ এক মনে বলে চলেছেন—লোভ। লোভ বড় মারাত্মক জিনিস। ছোঁয়াচে। ছেলেটার মা লোভে পড়ে গেল। বোনেরা লোভে পড়ে গেল। আমিও কি লোভে পড়ে গিয়েছিলাম? নইলে আমিও এতদিন চুপ করে ছিলাম কেন? আমার অন্যায় কি কম, অনুতোষ?

অনুতোষ বিপিনবাবুর হাত ধরে ফেললেন --এ আপনি কি বলছেন? আপনি বৃদ্ধ মানুষ...

—বৃদ্ধ। অন্ধ তো নই। বিপিনবাবুর গলা কান্নায় বুজে গেল,

—তোমরা আমাকে একবারও ডাকলে না অনুতোষ? এরকম ক্রিমিনাল কারুর ছেলে হয় না। ভাই হয় না। স্বামী হয় না। চলো। তোমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে না?

শিব মন্দির থেকে একে একে বেরিয়ে এলেন পাঁচজন। পাঁচ জোড়া পা, একটা লাঠি। থানার দিকে এগোচ্ছেন। কাছাকাছি এসে প্রিয়ব্রত থমকে দাঁড়ালেন। থানার সামনে দাঁড়িয়ে বুড়ো রিক্সাঅলাটা,

—এত দেরি করলেন কেন বাবু? আমি কখন থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছি।

প্রিয়ব্রত অবাক—তুমি কি করে খবর পেলে?

—রামনগরের সব ঘরই তো জানে। বাতাসে খবর উড়ছে। আজ সকালে আমার রিক্সায় বসে দুই বাবু তো এই নিয়েই কথা বলছিল। তাদেরও নাকি আসার কথা। কিন্তু আসতে পারবে না। হাঃ। সব ভয়ে কাঁপছে।

—তোমার ভয় নেই?

—কিসের ভয়? জানটার? একটা পা তো চিতায় দিয়েই আছি। বড় জোর

আরেকটা পা ঢুকে যাবে। আর জানেনই তো বাবু আমাদের মানটানের বালাই নেই। ওসব আপনাদের সাজে। যারা এসব নোংরা কাজ করে। আর সামলায়।

প্রিয়ব্রত লোকটার পিঠে হাত রাখলেন—এসো।

৮ই মে বেলা একটা

—আপনারা এত অবুঝ হচ্ছেন কেন? ডি এম একটু পরেই আসছেন। আমিও ও সি-র ফোন পেয়েই চলে এসেছি। আপনাদের সঙ্গেই দেখা করব বলে। এস্ পি-র গলায় মিনতি ঝরে পড়ল, —কাল দুজন কালপ্রিট তো ধরা পড়েছে। কাজল দত্তর নামে ওয়ারেন্ট ইস্যু হয়েছে...

—ওয়ারেন্টের গল্প আর আমাদের শুনিয়ে কাজ নেই। অনুতোষ বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, —যেখানে এম এল এ-র বাড়িতে কালপ্রিট লুকিয়ে থাকে, সেখানে ওয়ারেন্ট দিয়ে কি হবে মশাই?

—এটা কিন্তু আপনারা ঠিক বলছেন না। রমেনবাবুই তো নিজে উদ্যোগ নিয়ে এই ছেলে দুটোকে অ্যারেস্ট করিয়েছেন। আপনারা একটু বেশি...সি এম কালকেই নিউজপেপার দেখে আই জি আর ডি এম-কে অর্ডার করেছেন...ধরার চেষ্টা তো হচ্ছেই। হি ইজ অ্যাবস্কন্ডিং।

এস পি ওসির চেয়ারে বসে আছেন। ওসি পাশের চেয়ারে। দরজার কাছে তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে মেজ দারোগা। সেদিনের সেই ডিউটি অফিসার। দরজার বাইরেই তিনজন কন্সটেবল। গোটা থানা জুড়ে একটা টানটান ভাব। পিন পড়লেও শব্দ শোনা যাবে।

ওসি খুব বিনীত মুখে তাকালেন প্রিয়ব্রতর দিকে.

—অল পসিব্‌ল প্লেসে সার্চ করা হয়েছে। আমি কথা দিচ্ছি...

—কথা তো আপনি আগেও দিয়েছিলেন। অনুতোষেব গলায় বিদ্রূপ।

এস পি এবার একটু আড়াল করার চেষ্টা করলেন নিজের বাহিনীকে—এঁদেরকেও তো নানান প্রেসারে কাজ করতে হয়। চাকরির ভয় আছে। বদলির দুশ্চিন্তা আছে। আপনারা তো সবই বোঝেন...দেখছেনও তো কয়েকদিন ধরে ...আমাদের অবস্থাটাও একটু ভাবুন।

—সেজন্যই তো ভয়। বিপিনবাবু এই প্রথম কথা বললেন—যেখানে রক্ষকরাই নিজেদের ঠিক মত রক্ষা করতে পারে না, ভয়ে ভয়ে থাকে, সেখানে এঁদের নিরাপত্তার যে কি অবস্থা হবে!

ও সি-র এতক্ষণে নজর পড়েছে পেছন দিকে চেয়ারে গুটি সুটি মেরে বসা

বিপিনবাবুর দিকে। ভীষণরকম চমকে উঠেছেন, কাজলকে ও এই মুহূর্তে থানায় দেখলে এতটা অবাক হতেন না যেন।

ও সি-র চমকে ওঠা এস পি-র নজর এড়াল না,

—কে ইনি?

ও সি কিছু বলবার আগে, বিপিনবাবুই বলে উঠেছেন,

—আমি বিপিন বিহারী দত্ত। মেইন কালপ্রিট কাজল দত্তর বাবা।

৯ই মে ভোর পাঁচটা

জগিং করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিল ওরা। পুরনো পল্লীর ফুটবল মাঠের দিকে। দৌড়চ্ছে। দৌড়তে দৌড়তে নিঃশ্বাস নিচ্ছে মাথা তুলে। আবার দৌড়ল। হাঁটু তুলে বুকে ঠেকাল একজন। অন্যজন দুহাত ছড়িয়ে দিল। আরও দম বাড়ানো দরকার। আরও। হা হা শব্দ করে আবার ফুসফুসে অক্সিজেন ভরে নিল। দাঁড়িয়ে পড়ে এক সঙ্গে ঘাড় দোলালো দুজনে। ঘাড়ের পেছনে হাত। শরীরটাকে আরও তাজা করতে হবে। চনমনে।

ভোরের পৃথিবী উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে ক্রমশ। আকাশ ঝকঝকে। প্রথম সকালের গন্ধ ছড়িয়ে আছে চতুর্দিকে। মাঠের পূর্বদিকে ছোট্ট জলাভূমি। তার ওপারে রাবার কারখানার উঁচু পাঁচিল। কিছু ঝোপঝাড়। আগাছা।

ছেলে দুটো মাঠের এ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল,

—দেখেছিস?

—তাই তো। কে একজন পড়ে আছে মনে হচ্ছে!

পায়ে পায়ে এগোল দুজনে। সামনে গিয়ে শিউরে উঠেছে। জলা আর আগাছার মাঝামাঝি জায়গায় একটা লাশ। পরনে ব্লু জিনস্। গোলাপি টি শার্ট। এক মাথা এলোমেলো চুল। দামি রিস্টওয়াচ বাঁধা হাতে। মুখটা উল্টোদিকে ফেরানো।

ছেলে দুটো পরস্পরের হাত চেপে ধরে আর একটু এগোল। বিস্ফারিত চোখে ঝুঁকেছে। কপালে পরপর দুটো গোল গর্ত। বুলেটের। সেখান থেকে কালো জমাট রক্ত নাক বেয়ে গড়িয়ে গেছে গালে। কাঠ পিঁপড়েরা সারি দিয়ে উঠছে বুক থেকে কপালে।

—চিনতে পারছিস? একজন ফিসফিস করে উঠল।

—কাজল দত্ত। অন্যজনের গলা ঘড়ঘড় করে উঠেছে।

—চল, কেটে পড়ি।

ওরা সরে যাওয়ার আগেই আরও দু-তিনজন লোক এগিয়ে এসেছে। তাদের দেখাদেখি আরও কয়েকজন। একটু একটু করে ভিড় জমে গেল।

—ইসস্। মেরেই দিল!

—কার কাজ বলুন তো?

—কার আবার? বোঝাই তো যায়...

—হ্যাঁ, ওই রমেন সিংহ ..

—পুলিশও হতে পারে।

-নাকি অপোজিশন।

—বেশি আলোচনা না করাই ভাল।

—যা বলেছেন।

—কাজলকে যাদের দরকার ছিল, তাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

হ্যাঁ। কাজলের দিন শেষ। এবার হয়ত রতনের দিন শুরু। কিম্বা গণেশের। অথবা অন্য কোন কাজলের।

ভিড় পাতলা হচ্ছে আস্তে আস্তে। কিছুক্ষণের জন্য উত্তেজিত রামনগরের মানুষেরা আবার থিতিয়ে এল। যে যার নিজের কাজে ফিরছে। উদাসীন। নিরুত্তাপ। নিস্পৃহ।

রামনগর প্রাইমারি স্কুল থেকে কোরাসে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর ভেসে আসছে তখন। শিশু কণ্ঠের গান ভাসতে ভাসতে দিকদিগন্তে ছড়িয়ে গেল। আজ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন।